ইতিহাস

দ্বি বার্ষিক সেমেস্টার ভিত্তিক স্নাতকোত্তর পাঠক্রম

এম এ চতুর্থ সেমেস্টার

ঐচ্ছিক পাঠ ৪০৩

DSE-403

History of Medicine in India

সহায়ক গ্রন্থ

DIRECTORATE OF OPEN AND DISTANCE LEARNING (DODL),

UNIVERSITY OF KALYANI,

KALYANI, NADIA.

বিষয় সমিতি

১) শ্রী আলোক কুমার ঘোষ, (প্রধান, ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)—সভাপতি।

২) ডঃ সুতপা সেনগুপ্ত (ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)—সদস্য।

৩) অধ্যাপক অনিল কুমার সরকার (ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)—সদস্য।

৪) অধ্যাপক রূপকুমার বর্মণ (ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)—সদস্য।

৫) অধ্যাপক মনশান্ত বিশ্বাস (ইতিহাস বিভাগ, সিধু-কানহু-বিরশা বিশ্ববিদ্যালয়)—সদস্য।

৬) শ্রী সুকৃত মুখার্জ্জী (চুক্তিভিত্তিক সহকারী অধ্যাপক, ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)—সদস্য।

৭) শ্রীমতী পুবালি সরকার (চুক্তিভিত্তিক সহকারী অধ্যাপক, ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)—সদস্য।

৮) অধিকর্তা, ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)—আহ্বায়ক।

- গ্রন্থটি বিভিন্ন বই ও ইন্টারনেট সূত্র থেকে তথ্য একত্র করে নির্মিত।
- প্রণেতাগণ এর মৌলিকত্ব দাবী করেন না।

April, 2024

Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani

Published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal

Printed by East India Photo Composing Centre, 209A, Bidhan Sarani, Kolkata-700006

All rights reserved. No part of this work should be reproduced in any form without the permission in writing from the Directorate of Open and Distance Leaming, University of Kalyani.

Director's Message

Open and Distance Learning (ODL) systems play a threefold role-satisfying distance learners' needs of varying kinds and magnitudes, overcoming the hurdle of distance and reaching the unreached. Nevertheless, this robustness places challenges in front of the ODL systems managers, curriculum designers, Self Learning Materials (SLMs) writers, editors, production professionals and other personnel involved in them. A dedicated team of the University of Kalyani under the leadership of Hon'ble Vice-Chancellor has put its best efforts, professionally and in unison to promote Post Graduate Programmes in distance mode offered by the University of Kalyani. Developing quality printed SLMs for students under DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2020 had been our endeavour and we are happy to have achieved our goal.

Utmost care has been taken to develop the SLMs useful to the learners and to avoid errors as far as possible. Further suggestions from the learners' end would be gracefully admitted and to be appreciated.

During the academic productions of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from Professor (Dr.) Amalendu Bhunia, Hon'ble Vice- Chancellor, University of Kalyani, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it within proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Due sincere thanks are being expressed to all the Members of PGBOS (DODL), University of Kalyani, Course Writers-who are serving subject experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have been utilized to develop these SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I would like to convey thanks to all other University dignitaries and personnel who have been involved either at a conceptual level or at the operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their concerted efforts have culminated in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyright reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any from without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self Learning Materials are self writing and collected from e-book, journals and websites.

Date: 24.04.2024

Director
Directorate of Open & Distance Learning
University of Kalyani,
West Bengal

Syllabus

DSE-403 : History of Medicine in India **Credit-4**

BLOCK 1: Conceptual aspects of medicine

Unit-1: Preventive & Curative.

Unit-2: Relevance of the history of the development of Medicine and surgery in ancient India with special reference to Caraka and Susruta.

Unit-3: Medicine in medieval and pre-colonial India.

BLOCK-2: Indigenous systems of medicine

Unit-4: Ayurveda, Unani etc.

Unit-5: Oriental-occidental conflict

Unit-6: Development of western medicine.

BLOCK 3: Diseases and epidemics in colonial India.

Unit-7: Malaria, Cholera, Tuberculosis as epidemic in Colonial India.

Unit-8: Pandemic and popular perception of medicine in contemporary India.

BLOCK 4: Growth of medical education.

Unit-9: Early initiatives: native medical institutes.

Unit-10: Calcutta Madrasa, Sanskrit College.

Unit-11: Establishment and early history of Calcutta Medical College.

BLOCK 5: Medicine & Medical Practitioners/Researchers.

Unit-12: Madhusudan Gupta, Radhagobinda Kar

Unit-13: Nilratan Sarkar, Kedarnath Das, Upendranath Brahmachari, Subhas Mukhopadhyay etc.

Unit-14: Women & Medicine –Anandabai Joshi, Kadambini Gangopadhyay, Haimabati Sen etc.

BLOCK 6: Health for all – Peoples' Health Movement.

Unit-15: Peoples' Health Movement.

Unit-16: Health system and medical insurance.

ACKNOWLEDGEMENT

Content	Page
BLOCK 1: Conceptual aspects of medicine	**0**
BLOCK-2: Indigenous systems of medicine	**0**
BLOCK 3: Diseases and epidemics in colonial India	**0**
BLOCK 4: Growth of medical education	**0**
BLOCK 5: Medicine & Medical Practitioners/Researchers	**0**
BLOCK 6: Health for all–Peoples' Health Movement	**0**

পর্যায়-১

একক-১-২-৩

বিন্যাসক্রম

৪০৩.১.১ উদ্দেশ্য
৪০৩.১.২ **Preventive and Curative Medicine**
৪০৩.১.৩ নিরাময়মূলক স্বাস্থ্যসেবা **(Curative Medicine)**
৪০৩.১.৪ প্রাচীন ভারতে চিকিৎসা ব্যবস্থা
৪০৩.১.৫ কালপঞ্জি
৪০৩.১.৬ রচয়িতা
৪০৩.১.৭ অন্তর্ভুক্তি
৪০৩.১.৮ প্রসার
৪০৩.১.৯ অধ্যায়সমূহ
৪০৩.১.১০ মানব কঙ্গালতন্ত্র
৪০৩.১.১১ ভেষজ ঔষধি
৪০৩.১.১২ রাইএনাপ্লাস্টি
৪০৩.১.১৩ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৪০৩.১.১ উদ্দেশ্য

বর্তমান পর্যায়টির অধ্যয়ন করে ছাত্র ছাত্রীরা চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞানের পাশাপাশি প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতের চিকিৎসা বিষয়ের সম্যক ধারণা করতে পারবে।

৪০৩.১.২ Preventive and Curative Medicine

প্রতিষেধক চিকিৎসা ব্যবস্থা (Preventive Medicine) হল, রোগ প্রতিরোধের জন্য আগাম ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া। সামগ্রিকভাবে সমাজে-যা আরও ব্যাপকভাবে জনস্বাস্থ্য হিসাবে পরিচিত তার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রতিরোধমূলক ওষুধ, রোগের ঝুঁকি কমানোর পাশাপাশি, অক্ষমতা এবং মৃত্যু প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

খ্রিস্টপূর্ব ৫ম শতাব্দীর গ্রীক চিকিৎসক হিপোক্রেটিস রোগের কারণগুলিকে ঋতু, জলবায়ু এবং বাহ্যিক

অবস্থার সাথে সম্পর্কিত এবং সেই ব্যক্তিদের অনিয়মিত খাদ্য, ব্যায়াম এবং অভ্যাসের মতো আরও ব্যক্তিগত কারণগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন। মধ্যযুগে কুষ্ঠরোগ এবং প্লেগ রোগের আতঙ্ক সত্ত্বেও প্রতিরোধমূলক ওষুধের নীতিগুলি উপেক্ষিত হয়েছিল। রেনেসাঁর সাথে নতুন শিক্ষা এসেছিল যা চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিপ্লব ঘটায়। অনুশীলনকারীরা আবার ঋতু, পরিবেশগত অবস্থা এবং রোগের ঘটনার মধ্যে সম্পর্ক পর্যবেক্ষণ করেন।

চিকিৎসা সংক্রান্ত জ্ঞানের বৃদ্ধির সাথে সাথে ব্যবহারিক প্রতিরোধের ধারনা প্রসারিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, ইংল্যান্ডে ১৩৮৮ সালে first sanitary act পাস হয়েছিল, ১৪৪৩ সালে প্রথম প্লেগ আদেশ আসে যা রুগীদের পৃথকীকরণ এবং পরিবেশ পরিষ্কার রাখার সুপারিশ করে; এবং ১৫১৮ সালে মহামারী রোগের বিজ্ঞপ্তি এবং রোগীকে বিচ্ছিন্ন করার প্রথম প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। ১৭ শতকে ইংল্যান্ডে মৃত্যুর পরিসংখ্যানের অধ্যয়ন শুরু হয়েছিল। ১৭ শতকের মাঝামাঝি সময়ে মহামারীবিদ্যার ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল। ১৮ শতকের প্রথমার্ধে একজন ইংরেজ গবেষক বিষ, প্লেগ এবং এর প্রতিরোধের পদ্ধতি এবং গুটিবসন্ত, হাম এবং স্কার্ভি নিয়ে লিখেছিলেন। Edward Jenner, ১৭৯৮ সালে গুটি বসন্তের প্রতিষেধক আবিষ্কার করেন। একে আমরা বিশ্বের প্রথম ভ্যাকসিন বলতে পারি। Edward Jenner কে Father of Vaccination বলা হয়। ১৯ শতকের প্রথম ও মধ্য বছরগুলি টাইফাস, কলেরা, টাইফয়েড জ্বর এবং পিউয়েরপেরাল জ্বরের মতো সংক্রামক রোগের সংক্রমণের আবিষ্কারের জন্য উল্লেখযোগ্য ছিল। একই সময়ে স্বাস্থ্যবিধি এবং পুষ্টির সমস্যার দিকে ক্রমবর্ধমান মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল।

১৯ শতকের মাঝামাঝি সময়ে প্রতিরোধমূলক ওষুধের আধুনিক যুগের সূচনা হয়। লুই পাস্তুর (Louise Pateur) সংক্রমণের কারণ হিসেবে জীবন্ত জীবাণুর ভূমিকা (role of microbes as the cause of infection) আবিষ্কার করেন। শতাব্দীর শেষের দিকে পোকামাকড় দ্বারা রোগের সংক্রমণের নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেরোলজিকাল পরীক্ষাগুলি তৈরি করা হয়েছিল, যেমন টাইফয়েড জ্বরের জন্য Widal reaction (১৮৯৬) এবং সিফিলিসের জন্য Wassermann test (১৯০৬)। অনাক্রম্যতার নীতিগুলি বোঝার ফলে নির্দিষ্ট রোগের সক্রিয় ইমিউনাইজেশনের বিকাশ ঘটে। চিকিতার সমান্তরাল অগ্রগতি, রোগ প্রতিরোধের জন্য অন্যান্য দরজা খুলে দিয়েছে-অ্যান্টিটক্সিন দ্বারা ডিপথেরিয়াতে এবং আর্সফেনামিন দ্বারা সিফিলিসে। ১৯৩২ সালে সালফোনামাইড ওষুধ এবং পরে পেনিসিলিন, স্ট্রেপ্টোমাইসিন, ক্লোরটেট্রাসাইক্লিন এবং ক্লোরামফেনিকল সহ অ্যান্টিবায়োটিকগুলি ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ের নতুন সুযোগ তৈরি করে।

১৯০০ সালের পরে সংক্রামক রোগের সাথে সম্পর্কিত ওষুধগুলি ছাড়া প্রতিরোধমূলক ওষুধে অনেক অগ্রগতি হয়েছিল। রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসায় (যেমন, যক্ষ্মা এবং ক্যান্সার) পাশাপাশি মৌলিক শারীরবৃত্তীয় গবেষণায় এক্স-রে এবং তেজস্ক্রিয় পদার্থের ব্যবহার নতুন সম্ভাবনার সূচনা করেছে। ইনসুলিনের মতো প্রস্তুত হরমোন নির্যাস উৎপাদনের সাথে অন্তঃস্রাবী ফাংশনগুলির একটি বৃহত্তর উপলব্ধি নির্দিষ্ট বিপাকীয় রোগে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার দিকে পরিচালিত করে। স্বাস্থ্য এবং রোগে পুষ্টির ভূমিকা এবং অনেক প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদানের বিচ্ছিন্নতা পর্যাপ্ত খাদ্যের স্বাস্থ্যের গুরুত্বকে চিত্রিত করে। একাধিক রোগ, বিশেষ করে ফুসফুসের ও মুখের ক্যান্সার এবং লিভারের রোগ প্রতিরোধের জন্য যথাক্রমে ধূমপান ত্যাগ এবং অ্যালকোহল সেবন হ্রাস করা গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে স্বীকৃত।

২০ এবং ২১ শতকে প্রতিরোধমূলক ওষুধের অগ্রগতির মধ্যে মোট স্বাস্থ্য, নতুন অস্ত্রোপচারের কৌশল, অ্যানেস্থেশিয়ার নতুন পদ্ধতি এবং জেনেটিক্স গবেষণা ছাড়াও মানসিক স্বাস্থ্যের স্বীকৃতি অন্তর্ভুক্ত ছিল। ক্যান্সার

সনাক্তকরণে অগ্রগতি বিভিন্ন ম্যালিগন্যান্সির জন্য উন্নত স্ক্রীনিং এর দিকে পরিচালিত করে; উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে কোলোরেক্টাল ক্যান্সার স্ক্রীনিংয়ে কোলনোস্কোপির ব্যাপক ব্যবহার, স্তন ক্যান্সার স্ক্রীনিংয়ে ম্যামোগ্রাফি এবং সার্ভিকাল ক্যান্সারে প্যাপ স্মিয়ার এবং হিউম্যান প্যাপিলোমাভাইরাস টেস্টিং। উচ্চতর কোলেস্টেরলের মাত্রা এবং উচ্চ রক্তচাপের জন্য স্ক্রীনিংগুলি কার্ডিওভাসকুলার রোগ প্রতিরোধ, সনাক্তকরণ এবং নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৪০৩.১.৩ প্রতিরোধমূলক পদ্ধতি কি?

প্রতিষেধক ওষুধ তার নাম অনুসারে কাজ করে-এটি অসুস্থতা হওয়ার আগেই প্রতিরোধ করতে কাজ করে।

এর মতাদর্শ স্বাস্থ্য ও মঙ্গল রক্ষা, প্রচার এবং বজায় রাখার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এতে রোগ প্রতিরোধ, অক্ষমতা এড়ানো এবং বৃহত্তরভাবে ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রাণহানি এড়ানোর লক্ষ্যে কৌশল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

নাম অনুসারে, প্রতিরোধমূলক যত্নের মধ্যে রোগ বা সংক্রমণ যাতে শরীরে প্রভাব না পড়ে, যেমন টিকা, স্ক্রীনিং পরীক্ষা, ডায়াগনস্টিক পরীক্ষা এবং বার্ষিক মেডিকেল চেকআপের ব্যবস্থা রয়েছে।

১. নিয়মিত স্ক্রীনিং

বছরে একবার বা দুবার স্ক্রীনিং করা হয় এমন অনেক রোগকে বাদ দিতে সাহায্য করা হয় যা অগ্রগতি হতে পারে এবং অলক্ষ্যে আরও খারাপ হতে পারে। ম্যামোগ্রাম, কোলনোস্কোপি, এন্ডোস্কোপি, পিএপি স্মিয়ার পরীক্ষা এবং স্তন পরীক্ষাগুলির মতো স্ক্রীন পরীক্ষাগুলি প্রাথমিক পর্যায়ে স্তন, কোলন, প্রোস্টেট, খাদ্যনালী এবং জরায়ুর ক্যান্সার সনাক্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ।

২. ভ্যাকসিন সময়সূচী

সাম্প্রতিক মহামারী রোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে ভ্যাকসিনের গুরুত্বকে বাড়িয়ে তুলেছে। শট এবং টিকা শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য অনেক রোগ থেকে দীর্ঘমেয়াদী অনাক্রম্যতা প্রদান করে। ভ্যাকসিনগুলি অনেক ক্ষেত্রে আজীবন অনাক্রম্যতা প্রদান করতে পারে, প্রমাণ করে যে তারা প্রতিরোধমূলক যত্নের অন্যতম সেরা পদ্ধতি। যেমন-কোভিড টিকা, পোলিও টিকা।

৩. অন্যান্য পরীক্ষা

নিয়মিত রক্ত পরীক্ষাগুলি মানুষকে রক্তের গ্লুকোজ, কোলেস্টেরল, হরমোনের মাত্রা এবং উচ্চ রক্তচাপের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরামিতিগুলি ট্র্যাক করতে সক্ষম করে, যার সবগুলিই ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপের মতো দীর্ঘস্থায়ী অবস্থার সূচক।

৪. সুস্থতা প্রোগ্রাম

যোগব্যায়াম, জুম্বা, ক্রসফিট, মেডিটেশন, মানসিক স্বাস্থ্যসেবা, পাইলেট ইত্যাদির মতো সমস্ত সুস্থতা প্রোগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী রোগ প্রতিরোধের লক্ষ্য রাখে এবং সুস্থ ও সক্রিয় জীবনধারা বজায় রাখতে সহায়তা করে।

কেন প্রতিরোধমূলক ঔষধ গুরুত্বপূর্ণ?

প্রতিষেধক ওষুধের অনুশীলন করা যেকোনো দেশের স্বাস্থ্যসেবা ব্যয়কে ব্যাপকভাবে কমিয়ে দিতে পারে। সেন্টার ফর ডিজিজ কন্টোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি) অনুসারে, বার্ষিক স্বাস্থ্য বাজেটের একটি বড় পরিমাণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দীর্ঘস্থায়ী এবং বহুলাংশে প্রতিরোধযোগ্য রোগের দিকে যায়।

স্বাস্থ্য আচরণ, পারিবারিক ইতিহাস এবং বাহ্যিক পরিবেশ সহ সমস্ত ঝুঁকির কারণগুলির একটি সতর্ক বিশ্লেষণ স্বাস্থ্য এবং জীবনধারা পছন্দগুলির একটি সম্পূর্ণ চিত্র দিতে পারে যা সুস্থ থাকতে, দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্যের অবস্থার বিকাশের ঝুঁকি হ্রাস করতে বা প্রভাবগুলি হ্রাস করতে হবে। রোগের এটি সবচেয়ে সাধারণ অসুস্থতা প্রতিরোধের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যা শয্যাশায়ী হওয়া, গতিশীলতা হ্রাস বা উচ্চ রক্তচাপের মতো যত্নের প্রয়োজন, অতিরিক্ত ওজন, ডায়াবেটিস, স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাক, ক্যান্সার এবং অস্টিওপোরোসিসের মতো গুরুতর প্রতিবন্ধকতার দিকে পরিচালিত করে।

আবার পোলিও, টিটেনাস, জলাতঙ্কের মত রোগের ক্ষেত্রে প্রতিরোধমূলক ভ্যাকসিন একমাত্র রক্ষাকবচ। এর কোন নিরাময়যোগ্য ওষুধ না থাকায় টিকার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪০৩.১.৪ নিরাময়মূলক স্বাস্থ্যসেবা (Curative Medicine)

নিরাময়মূলক স্বাস্থ্যসেবা পদ্ধতি হল প্রতিরোধমূলক পদ্ধতির বিপরীত, প্রাথমিকভাবে অসুস্থতা নিরাময় এবং দ্রুত পুনরুদ্ধারের দিকে মনোনিবেশ করে। প্রধান উদ্দেশ্য হল অসুস্থতা বা শারীরিক প্রতিবন্ধকতার অবস্থার সমাধান করা এবং অসুস্থতার আগে ব্যক্তিকে যে স্বাস্থ্যের অবস্থা ছিল সেই অবস্থায় ফিরিয়ে আনা।চিকিতার সম্পূর্ণ ফোকাস হবে রোগের কোনো শারীরিক সমস্যা দূর করা এবং রোগীর স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করা।

কিছু সেরা উদাহরণ হল :

কেমোথেরাপি যা অনেক ধরনের ক্যান্সার প্রতিরোধ এবং চিকিতা করতে সাহায্য করে। ক্যান্সার, অ্যাপেনডিসাইটিস এবং বড় কার্ডিয়াক সমস্যাগুলির মতো অনেক রোগ নিরাময়ের জন্য অস্ত্রোপচার একটি খুবই কার্যকর পদ্ধতি। ডায়ালাইসিস তরল এবং বর্জ্য পদার্থ অপসারণ করে এবং কিডনি ব্যর্থতার ক্ষেত্রে রক্তকে বিশুদ্ধ করে। হাইপারথাইরয়েডিজম, উদ্বেগ, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ এবং স্নায়ুর রোগের মতো দীর্ঘস্থায়ী রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য ওষুধ সেবন করা।

আবার হাড়ভাঙ্গা, অস্থিরোগ, আগুনে পোড়া, হার্ট ভাল প্রতিস্থাপন, স্ট্রোক প্রভৃতি ক্ষেত্রে Curative Medicine একমাত্র বিকল্প। আবার পক্ষাঘাত জনিত দুর্বলতা দূরীকরণে ফিজিওথেরাপিও Curative Medicine এর একটি অংশ।

৪০৩.১.৫ প্রাচীন ভারতে চিকিৎসা ব্যবস্থা

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে আয়ুর্বেদ চর্চা প্রচলিত হয়েছে। আয়ুর্বেদশাস্ত্র পাঠ করলে আয়ু সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য জানা যায়। যেমন জীবন স্বল্পায়ু না দীর্ঘায়ু হবে, রোগ মুক্ত জীবন, স্বাস্থ্য কীভাবে বজায় রাখা যায় ইত্যাদি। কথিত আছে, যে প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি করার পূর্বে এক লক্ষ শ্লোক ও এক হাজার অধ্যায়ে 'ব্রহ্মাসংহিতা' নামে একটি আয়ুর্বেদ শাস্ত্র রচনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে ব্রহ্মা তাঁর সৃষ্ট জীবকুলকে স্বপ্নায়ু ও স্বল্পধী দেখে সেই ব্রহ্মসংহিতাকে অষ্টাঙ্গে বিভক্ত করে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ সৃষ্টি করেন। এই শাস্ত্র সম্পর্কে ব্রহ্মার কাছ থেকে বিষ্ণু, শংকর, সূর্য, দক্ষপ্রজাপতি শিক্ষালাভ করেছিলেন। আবার দক্ষপ্রজাপতির কাছ থেকে অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং তাঁর কাছ থেকে ইন্দ্র শিক্ষা নিয়েছিলেন। এরপর ভরদ্বাজ, তাঁর কাছ থেকে আত্রেয়, আবার আত্রেয় থেকে অগ্নিবেশ, পরাশর, ক্ষারপাণি প্রভৃতি ঋষিগণ শিক্ষা নিয়েছিলেন।

আয়ুর্বেদ শব্দটিতে দুটি শব্দ আছে। 'আয়ু' এবং 'বেদ'। 'আয়ু' শব্দের অর্থ জীবন আর 'বেদ' শব্দের অর্থ জ্ঞান বা বিদ্যা অর্থাৎ আয়ুর্বেদ শব্দের পুরো অর্থ হল জীবনবিজ্ঞান বা জীববিদ্যা। যে জ্ঞানের মাধ্যমে জীবের হিত সাধন হয়, তাকে আয়ুর্বেদ বা জীববিদ্যা বলা হয়। আয়ুর্বেদ চিকিৎসা হলো মূলত ভেষজ বা উদ্ভিদের মাধ্যমে চিকিৎসা। অথর্ববেদের যে অংশে চিকিৎসা বিদ্যা বর্ণিত আছে তাই আয়ুর্বেদ। প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে ভারতবর্ষেই এই চিকিৎসা পদ্ধতির উৎপত্তি হয়।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ :

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদের আটটি অঙ্গ বা তন্ত্র রয়েছে। তা হল-(১) শল্য, (২) শলাকা, (৩) কায়চিকিৎসা, (৪) ভূতবিদ্যা, (৫) কৌমার ভৃত্য, (৬) অগদ, (৭) রসায়ন এবং (৮) বাজীকরণ।

আয়ুর্বেদশাস্ত্রের আটটি সম্প্রদায়। আয়ুর্বেদশাস্ত্রের কলেবর বিস্তৃত। তাই তন্ত্রকে অবলম্বন করে আটটি সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে। তা হল—

(১) আত্রেয়, (২) ধন্বন্তরি (৩) শালাক্য, (৪) ভূতবিদ্যা, (৫) কৌমার ভৃত্য, (৬) অগদতান্ত্রিক, (৭) রসায়ন তান্ত্রিক এবং (৮) বাজীকরণ তান্ত্রিক সম্প্রদায়।

চরক সংহিতা হ'ল ভারতীয় পরম্পরাগত ঔষধী ব্যবস্থা আয়ুর্বেদ-এর এক প্রাচীন গ্রন্থ। সুশ্রুত সংহিতার সাথে খ্রীষ্ট জন্মের কিছু শতক পরেই রচিত হওয়া এই গ্রন্থটি এই ব্যবস্থার প্রতিস্থাপক। অবশ্য এই গ্রন্থ দুটির প্রকৃত রচনাকাল সম্পূর্ণ স্পষ্ট নয়। চরক সংহিতার রচনাকাল গুপ্ত যুগ বা ৩০০র থেকে ৫০০ খ্রীষ্টাব্দের বলে মনে করা হয়ও সেইদিক থেকে দেখতে গেলে এটি সুশ্রুত সংহিতার প্রায় সমসাময়িক বা তার কিছু বছর পরে রচিত। যাই হোক,চরক সংহিতার বর্তমান উপলব্ধ সংস্করণটি ১০০ খ্রীষ্ট পূর্ব থেকে ১০০ খ্রীষ্টাব্দের ভিতর রচিত এক গ্রন্থের ওপরে ভিত্তি করে তৈরি করা একটি সংস্করণ। বর্তমান চরক সংহিতায় আটটা স্থান ও সর্বমোট ১২০ টা অধ্যায় আছে। সেই আটটা স্থান হ'ল-

১. সূত্র স্থান (৩০টা অধ্যায়), (এতে রোগ নিরাময়ের উপায়,সংবলিত পান-ভোজন ও চিকিৎসকের দায়িত্ব সমূহর বিষয় আছে।)
২. নিদান স্থান (৮ টা অধ্যায়), (এতে আটটা প্রধান রোগের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।)
৩. বিমান স্থান (৮ টা অধ্যায়), (এতে চিকিৎসা-জ্ঞান ও রোগের কারকের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।)

৪. শরীর স্থান (৮টা অধ্যায়), (এতে গর্ভাধান ও মানুষের শরীর-রচনার কথা আলোচনা করা হয়েছে।)

৫. ইন্দ্রিয় স্থান (১২টা অধ্যায়), (এতে রোগ নির্ণয় ও রোগের পূর্বাভাসের বিষয়ে বিশদ ভাবে আলোচনা করা হয়েছে।)

৬. চিকিৎসা স্থান (৩০টা অধ্যায়), (এতে বিশেষ চিকিৎসা সমূহর বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।)

৭. কল্প স্থান (১২টা অধ্যায়), (এতে সাধারণ চিকিৎসার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।)

৮. সিদ্ধি স্থান (১২টা অধ্যায়), (এতে সাধারণ চিকিৎসার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।)

এতে চিকিৎসা স্থানর ১৭টা অধ্যায় ও কল্প স্থান তথা সিদ্ধি স্থান সম্পূর্ণ ভাবে দৃধবলের (পঞ্চম শতাব্দী) দ্বারা পরে যোগ করা হয়েছিল। আয়ুর্বেদিক প্রয়োগের সাধারণ ও মৌলিক সিদ্ধান্ত সমূহ সংবলিত "সূত্র স্থান"-এর আরম্ভ হওয়া চরক সংহিতার অনন্য বৈশিষ্ট্য সমূহ হ'ল

- রোগের কারণ ও নিরাময় আবিষ্কারের এক যুক্তিসংগত আলোচনা
- পরীক্ষার বস্তুবাচক কৌশল

"প্রত্যক্ষ প্রমাণ আয়ুর্বেদ-এর এক উল্লেখযোগ্য দিক। সংহিতায় বলা হয়েছে যে সকল প্রমাণের ভিতর প্রত্যক্ষ প্রমাণই সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য। এই ব্যবস্থাতে কোনো রোগের এক সফল চিকিৎসা চারটি কারকের ওপরে নির্ভরশীল চিকিৎসক, ঔষধ, শুশ্রুষাকার ও রোগী। একজন চিকিৎসকের গুণ সমূহ হ'ল প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, এক বৃহৎ পরিসরের অভিজ্ঞতা, ব্যবহারিক দক্ষতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা; একটি ঔষধের গুণ সমূহ হ'ল সহজলভ্যতা, ব্যবহারোপোযোগীতা, ব্যবহারবহুলতা ও উতৃষ্ট দক্ষতা; শুশ্রুষাকারের গুণ সমূহ হ'ল শুশ্রুষা কৌশল সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান, ব্যবহারিক দক্ষতা, রোগীর প্রতি দায়বদ্ধতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা; এবং রোগীর গুনাগুণ সমূহ হ'ল ভাল স্মৃতিশক্তি, চিকিৎসকের নীতি-নির্দেশনার প্রতি সম্মান,সাহস ও লক্ষণসমূহ যথাযথভাবে বর্ণনা করার দক্ষতা।"]

টীকাসমূহ

চরক সংহিতার ওপরে রচিত সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পাদটীকাটি হ'ল চক্রপানি দত্ত (১০৬৬) রচিত "চরকতাৎর্যটীকা" বা "আয়ুর্বেদ দীপিকা"। অন্যান্য টীকাসমূহের ভিতর ভট্টরক হরিশচন্দ্রর "চরকন্যাস" (৬শতক), "নিরন্তরপাদব্যাখ্যা" (৮৭৫), শিবদাস সেনের "চরকতত্ত্বপ্রদীপিকা"' (১৪৬০) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এই সংহিতার ওপর রচিত উৎকৃষ্ট টীকাসমূহ হল নরসিংহ কবিরাজের "চরকতত্ত্বপ্রকাশ ও *গংগাধর কবিরত্নর জল্পকল্পতরু* (১৮৭৯)।

চরক সংহিতার মতে শুশ্রুষাকারের গুণ

'চরকের মতে শুশ্রুষাকার সকল ভাল ব্যবহার তথা বিশুদ্ধ চরিত্রের, বুদ্ধিমান ও দক্ষ, দয়ালু, রোগীকে নিরীক্ষা করে সকল সুবিধা দেয়ার সমকক্ষ, খাদ্য তৈরী করতে পারঙ্গম, রোগীর গা ও হাত-মুখ ধুইয়ে দিতে সক্ষম, হাত-পা মালিশে সিদ্ধহস্ত, বিছানা ও কাপড়চোপড় পরিষ্কার করতে উপযুক্ত জ্ঞান থাকা ও রোগীর

আরোগ্য লাভ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকতে ইচ্ছুক তথা আদেশ লাভ করা কোনো কার্য উপেক্ষা করতে অনিচ্ছুক হতে হয়।'

চরক-এক ঐতিহাসিক চরিত্র

সংস্কৃত ভাষায় চরক মানে পরিভ্রমী ধার্মিক শিষ্য বা গোড়া ধার্মিক ব্যক্তি। আয়ুর্বেদ চিকিৎসার পিতৃস্বরূপ চরকের জন্ম সম্বন্ধে বহু ঐতিহাসিক কথন প্রচলিত। এর একটির মতে, একবার আয়ুর্বেদ-এর উপাসক সর্থেকেজ আকাশপথে পৃথিবী পরিভ্রমণ করার সময় দেখলেন যে, পৃথিবী রোগ-জরায় পরিপূর্ণ। তা দেখে তিনি ব্যথিত হন ও পৃথিবীতে থাকা রোগ সমূহ নিরাময়ের জন্য একজন মুনির সন্তান হিসাবে জন্ম গ্রহণ করতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যেহেতু তিনি এক "চর" হিসাবে পৃথিবী ভ্রমণ করেছিলেন, তাই তিনি চরক হিসাবে পরিচিত হন। তার পরে অগ্নিবেশ ইত্যাদি আত্রেয়র শিষ্যসমূহের লিখনের ওপর ভিত্তি করে চিকিৎসা সম্বন্ধে এক নতুন গ্রন্থ প্রণয়ন করা হয়।

সুশ্রুত সংহিতা হলো চিকিৎসা বিজ্ঞান ও শল্যবিদ্যার উপর একটি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ, যা টিকে থাকা চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলোর মাঝে একটি। চরক সংহিতা, ভেল সংহিতা এবং বাওয়ার পাণ্ডুলিপির চিকিৎসা অংশের পাশাপাশি সুশ্রুতের সংকলন আয়ুর্বেদের অন্যতম মৌলিক গ্রন্থ। এটি চিকিৎসা পেশা সম্পর্কিত দুটি মৌলিক হিন্দু গ্রন্থের একটি যা প্রাচীন ভারত থেকে বর্তমান পর্যন্ত টিকে আছে।

সুশ্রুত সংহিতা ঐতিহাসিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে ঐতিহাসিকভাবে এমন অধ্যায় রয়েছে যেগুলো শল্যবিদ্যা, যন্ত্রবিদ্যা ও কৌশলের বর্ণনা করা হয়েছে যা বর্তমানেও আধুনিক বিজ্ঞানের শল্য চিকিৎসায় অনুসরণ করা হয়। তালপাতার পাণ্ডুলিপির প্রাচীনতম সুশ্রুত সংহিতাটি নেপালের কায়সার লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত রয়েছে।

৪০৩.১.৫ কালপঞ্জি

এক শতাব্দীরও বেশি আগে, পণ্ডিত রুডল্ফ হোর্নেল (১৮৪১—১৯১৮) প্রস্তাব করেছিলেন যে, শতপথ ব্রাহ্মণ, যেটি প্রথম-সহস্রাব্দ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মাঝামাঝি থেকে বৈদিক পাঠ, সুশ্রুতের মতবাদ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, সুশ্রুতের মতবাদের তারিখের উপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত। শতপথ ব্রাহ্মণের রচনার তারিখটি নিজেই অস্পষ্ট, হোয়ার্নল যোগ করেছেন এবং তিনি এটিকে খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দী বলে অনুমান করেছেন। সুশ্রুত সংহিতার জন্য হোর্নলের ৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের তারিখটি অনেক হস্তক্ষেপকারী পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও সমালোচনামূলকভাবে উদ্ধৃত করা অব্যাহত রয়েছে। অনেক পণ্ডিত পরবর্তীকালে কাজের তারিখ সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করেছেন, এবং এই অনেক মতামতকে মিউলেনবেল্ড তার হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল লিটারেচারে সংক্ষিপ্ত করেছেন। বস্লাফের মতে খ্রিস্টিয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী বর্তমান বিদ্যমান পাঠ্যের তারিখ বলে মনে করেন।কালানুক্রমিক সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু হল যে সুশ্রুত সংহিতা বিভিন্ন হাতের কাজ। পাণ্ডুলিপি পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠায় ও মধ্যযুগীয় ভাষ্যকারদের দ্বারা লিপিবদ্ধ অভ্যন্তরীণ ঐতিহ্য স্পষ্ট করে যে সুশ্রুত সংহিতা-এর পুরানো সংস্করণ ১-৫ ধারা নিয়ে গঠিত, যার ষষ্ঠ অংশটি পরবর্তী লেখক যোগ করেছেন। যাইহোক, আমাদের কাছে সবচেয়ে পুরনো পাণ্ডুলিপির কাজ ইতিমধ্যেই ষষ্ঠ অংশ রয়েছে।

সুশ্রুত সংহিতার কালপঞ্জির সবচেয়ে বিস্তারিত ও বিস্তৃত বিবেচ্য বিষয় হল যেটি মেউলেনবেল্ড

তার হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল লিটারেচার (১৯৯৯-২০০২)-এ প্রকাশ করেছেন। এই জটিল প্রশ্নের সমস্ত গুরুতর বিবেচনা এই কাজের সচেতনতা দেখাতে হবে। মেউলেনবেল্ড বলেছিলেন যে সুশ্রুত সংহিতা সম্ভবত এমন কাজ যাতে বেশ কয়েকটি ঐতিহাসিক স্তর রয়েছে, যার রচনাটি খ্রিস্টপূর্ব গত শতাব্দীতে শুরু হয়ে থাকতে পারে এবং এটির বর্তমান টিকে থাকা অন্য একজন লেখক দ্বারা সম্পূর্ণ করেছিলেন যিনি এর প্রথম পাঁচটি বিভাগ সংশোধন করেছেন ও দীর্ঘ, চূড়ান্ত বিভাগটি যোগ করেছেন, 'উত্তরতন্ত্র'।সম্ভবত সুশ্রুত সংহিতা পণ্ডিত দ্রোহবালা (৩০০-৫০০ খৃষ্টাব্দ) এর কাছে পরিচিত ছিল, যা আধুনিক যুগে টিকে থাকা কাজের সংস্করণের সর্বশেষ তারিখ দেয়।

৪০৩.১.৬ রচয়িতা

সুশ্রুত-কে পাঠ্যটির লেখক হিসাবে নামকরণ করা হয়েছে। ভগবান ধন্বন্তরি আয়ুর্বেদ সম্পর্কে সুশ্রুতকে যেসব উপদেশ দিয়েছিলেন, এই গ্রন্থে তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। পাঠ্যটিতে দেখা যায়, সুশ্রুত সহ অন্যান্য ঋষিগণ ধন্বন্তরির নিকট এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। দিবোদাস প্রথম ধন্বন্তরির নিকট রোগ নিরাময়ের উপায় নিয়ে প্রশ্ন করেন। এবং পরবর্তীতে শল্যতন্ত্রের উপদেশ প্রদানের জন্য জিজ্ঞাসা করতে সুশ্রুতকে বেছে নেওয়া হয়। দিবোদাসকে বৌদ্ধ জাতকের মতো প্রাথমিক গ্রন্থে বলা হয়েছে যে তিনি চিকিৎসক ছিলেন যিনি তক্ষশীলার (ঝিলম নদীর তীরে) অন্য মেডিকেল স্কুলের সমান্তরালে কাশী (বারাণসী) এর একটি স্কুলে পড়াতেন, কখনও কখনও খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ ও ৬০০ এর মধ্যে। সুশ্রুত সংহিতার ঐতিহ্যের সাথে দৃঢ়ভাবে যুক্ত সুশ্রুত নামের প্রাচীনতম উল্লেখগুলো বোওয়ার পাণ্ডুলিপিতে (খ্রিস্টীয় ৪র্থ বা ৫ম শতাব্দী), যেখানে সুশ্রুত হিমালয়ে বসবাসকারী দশজন ঋষির একজন হিসেবে তালিকাভুক্ত।

১৯৮৫ সালে রাও প্রস্তাব করেছিলেন যে মূল 'স্তর' এর লেখক ছিলেন 'বড় সুশ্রুত' (পুরাতন সুশ্রুত), যদিও এই নামটি প্রাথমিক সংস্কৃত সাহিত্যে কোথাও দেখা যায় না। রাও বলেন, পাঠ্যটি বহু শতাব্দী পরে সংশোধন করা হয়েছিল 'অন্য সুশ্রুত দ্বারা, তারপর নাগার্জুন দ্বারা, এবং তারপরে উত্তর-তন্ত্র পরিপূরক হিসাবে যোগ করা হয়েছিল।এটি সাধারণত পণ্ডিতদের দ্বারা গৃহীত হয় যে 'সুশ্রুত' নামে বেশ কিছু প্রাচীন লেখক ছিলেন যারা এই পাঠে অবদান রেখেছিলেন।

৪০৩.১.৭ অন্তর্ভুক্তি

অনেক পণ্ডিত এই পাঠটিকে হিন্দু পাঠ বলে অভিহিত করেছেন। পাঠ্যটি আরও প্রাচীন হিন্দু গ্রন্থে পাওয়া একই পরিভাষা সহ অস্ত্রোপচার নিয়ে আলোচনা করে, এর অধ্যায়ে হিন্দু দেবতা যেমন নারায়ণ, হরি, ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতার উল্লেখ আছে, হিন্দু ধর্মের ধর্মগ্রন্থ যেমন বেদকে বোঝায়, এবং কিছু ক্ষেত্রে, রোগীর চিকিৎসা ও পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ব্যায়াম, হাঁটা ও "বেদের ধ্রুবক অধ্যয়ন" করার পরামর্শ দেয়।[পাঠ্যটিতে সাংখ্য ও হিন্দু দর্শনের অন্যান্য দর্শনের পরিভাষাও ব্যবহার করা হয়েছে।

সুশ্রুত সংহিতা ও চরক সংহিতার সর্বত্র ধর্মীয় ধারণা রয়েছে, স্টিভেন এংলার বলেন, যিনি তারপরে উপসংহারে বলেছেন "বৈদিক উপাদানগুলোকে প্রান্তিক হিসাবে ছাড় দেওয়া খুব কেন্দ্রীয়"। এই ধারণাগুলোর মধ্যে রয়েছে পদ এবং একই রূপকগুলোর ব্যবহার যা হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলোতে বিস্তৃত—বেদ এবং প্রাচীন হিন্দুতে

পাওয়া সেইগুলোর লাইন ধরে কর্ম, স্ব (আত্মা) এবং ব্রহ্ম (আধিভৌতিক বাস্তবতা) তত্ত্বের অন্তর্ভুক্তিলেখা। যাইহোক, এঙ্গলার যোগ করেন, পাঠ্যটি ধারণার আরেকটি স্তরও অন্তর্ভুক্ত করে, যেখানে অভিজ্ঞতামূলক যুক্তিবাদী ধারণাগুলো ধর্মীয় ধারণাগুলোর সাথে প্রতিযোগিতা বা সহযোগিতার মাধ্যমে বিকাশ লাভ করে। ইঙ্গলারের অধ্যয়নের পরে, সমসাময়িক পণ্ডিতরা "ধর্মীয়" বনাম "অভিজ্ঞ-যুক্তিবাদী" পার্থক্যটি পরিত্যাগ করেছেন কারণ আর দরকারী বিশ্লেষণাত্মক পার্থক্য নেই।

পাঠটিতে বৌদ্ধ প্রভাব থাকতে পারে, যেহেতু নাগার্জুন নামে একজন রিডাক্টর অনেক ঐতিহাসিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, তিনি কি মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের খ্যাতির একই ব্যক্তি ছিলেন।[১৯] জিস্ক বলেছেন যে প্রাচীন বৌদ্ধ চিকিৎসা গ্রন্থগুলো সুশ্রুত ও চরক সংহিতা উভয়ের থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে আলাদা। উদাহরণ স্বরূপ, চরক ও সুশ্রুত উভয়েই কিছু ক্ষেত্রে ধূপনা (ধূপদান) সুপারিশ করে, এক শ্রেণীর চিকিৎসায় আগুন ও ক্ষার দিয়ে দাগ দেওয়ার ব্যবহার, এবং ক্ষতের চিকিৎসার প্রথম ধাপ হিসেবে রক্ত বের হওয়া। বৌদ্ধ পালি গ্রন্থে কোথাও এই ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতির উল্লেখ নেই। একইভাবে, সুশ্রুত ও পালি গ্রন্থের মধ্যে ঔষধি রজন (লক্ষ) তালিকার ভিন্নতা রয়েছে, কিছু সেটের উল্লেখ নেই। যদিও সুশ্রুত ও চরক কাছাকাছি, অনেক কষ্ট ও তাদের চিকিৎসা এই গ্রন্থগুলোতে পাওয়া যায় না পালি গ্রন্থে।

সাধারণভাবে, জিস্ক বলে, বৌদ্ধ চিকিৎসা গ্রন্থগুলো কারকের চেয়ে সুশ্রুতের কাছাকাছি, এবং তার গবেষণায় দেখা যায় যে সুশ্রুত সংহিতা সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব ১ম সহস্রাব্দের শেষের দিকে এবং হিন্দু দর্শন পরিচয় তৈরি হওয়ার পর সাধারণ যুগের প্রথম শতাব্দীতে একটি 'হিন্দুকরণ প্রক্রিয়া'র মধ্য দিয়েছিল। ক্লিফোর্ড বলেছেন যে প্রভাবটি সম্ভবত পারস্পরিক ছিল, বৌদ্ধ চিকিৎসা অনুশীলন তার প্রাচীন ঐতিহ্যে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর আদেশের বাইরে নিষিদ্ধ একটি নজির দ্বারা বুদ্ধ, এবং বৌদ্ধ গ্রন্থ তাদের ভূমিকায় হিন্দু দেবতার পরিবর্তে বুদ্ধের প্রশংসা করে। বিভিন্ন ভারতীয় ধর্মের মধ্যে চিকিৎসা ঐতিহ্যের পারস্পরিক প্রভাব, সুশ্রুত-সংহিতার স্তরগুলোর ইতিহাস অস্পষ্ট, বৃহত্তর ও কঠিন গবেষণা সমস্যা।

সুশ্রুতকে হিন্দু ঐতিহ্যে শ্রদ্ধার সাথে ধন্বন্তরীর বংশধর হিসেবে ধরা হয়, যিনি চিকিৎসার পৌরাণিক দেবতা, অথবা যিনি বারাণসীতে ধন্বন্তরির কাছ থেকে বক্তৃতা থেকে জ্ঞান লাভ করেছিলেন।

শ্রুত সংহিতার প্রাচীনতম পাম-পাতার পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে নেপালে আবিষ্কৃত হয়েছে। এটি কায়সার লাইব্রেরি-৬৯৯, নেপালে পাণ্ডুলিপি হিসাবে সংরক্ষিত আছে, এর ডিজিটাল কপি নেপাল-জার্মান পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ প্রকল্প (৮০/৭) দ্বারা সংরক্ষণ করা হয়েছে। আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত পাণ্ডুলিপিতে ১৫২টি ফোলিও রয়েছে, উভয় পাশে লেখা, ৬ থেকে ৮ লাইন ট্রানজিশনাল গুপ্ত লিপিতে। পাণ্ডুলিপিটি রবিবার, এপ্রিল ১৩, ৮৭৮ খৃষ্টাব্দ (মানদেব সংবত ৩০১) তারিখে লেখক দ্বারা সম্পূর্ণ করা হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়েছে।

সুশ্রুত-সংহিতার বেশিরভাগ বৃত্তি উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে প্রকাশিত পাঠ্যের সংস্করণগুলোর উপর ভিত্তি করে। এর মধ্যে রয়েছে বৈদ্য যাদবসর্মণ ত্রিবিক্রমাত্মজা আশ্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ সংস্করণ যাতে পণ্ডিত ডালহানের ভাষ্যও রয়েছে।

শ্রুত সংহিতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন চিকিৎসা গ্রন্থগুলোর মধ্যে একটি। এটি চরক সংহিতা, বেদ

সংহিতা ও বোওয়ার পাণ্ডুলিপির চিকিৎসা অংশগুলোর পাশাপাশি ভারতের চিকিৎসা ঐতিহ্যের অন্যতম মৌলিক পাঠ্য।

৪০৩.১.৮ প্রসার

সুশ্রুত সংহিতা চরক সংহিতার পরে রচিত হয়েছিল, এবং কিছু বিষয় এবং তাদের গুরুত্ব ব্যতীত, উভয়েই সাধারণ নীতি, প্যাথলজি, রোগ নির্ণয়, শারীরস্থান, সংবেদনশীল পূর্বাভাস, থেরাপিউটিকস, ফার্মাসিউটিকস ও টক্সিকোলজি।

সুশ্রুত ও চরক গ্রন্থগুলো প্রধান দিক থেকে পৃথক, যেখানে সুশ্রুত সংহিতা অস্ত্রোপচারের ভিত্তি প্রদান করে, অন্যদিকে চরক সংহিতা প্রাথমিকভাবে চিকিৎসার ভিত্তি।

৪০৩.১.৯ অধ্যায়সমূহ

সুশ্রুত সংহিতা, তার বর্তমান আকারে, ১৮৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত এবং এতে ১,১২০টি অসুখ, ৭০০টি ঔষধি গাছ, ৬৪টি খনিজ উৎস থেকে এবং ৫৭টি প্রাণীর উৎসের উপর ভিত্তি করে প্রস্তুতির বর্ণনা রয়েছে।

সুশ্রুত-সংহিতা দুটি ভাগে বিভক্ত প্রথম পাঁচটি বিভাগ (স্থান) পাঠ্যের প্রাচীনতম অংশ হিসেবে বিবেচিত হয় এবং "পরবর্তী বিভাগ" (উত্তরতন্ত্র) যা লেখক নাগার্জুন যোগ করেছিলেন। এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তু বৈচিত্র্যময়, কিছু বিষয় বিভিন্ন বইয়ের একাধিক অধ্যায়ে কভার করা হয়েছে।

প্রতিরোধ বনাম প্রতিকার

সুশ্রুত, একজন চিকিতকের উচিত রোগ প্রতিরোধের প্রচেষ্টা যতটা নিরাময়মূলক প্রতিকার পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করা উচিত। সুশ্রুত বলেন, রোগ প্রতিরোধের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়, শারীরিক ব্যায়াম এবং স্বাস্থ্যকর অনুশীলন। টেক্সট যোগ করে যে অত্যধিক কঠোর ব্যায়াম ক্ষতিকারক হতে পারে এবং রোগের জন্য আরও সংবেদনশীল করে তুলতে পারে, এই ধরনের অতিরিক্তের বিরুদ্ধে সতর্কতা। নিয়মিত পরিমিত ব্যায়াম, সুশ্রুত পরামর্শ দেয়, রোগ ও শারীরিক ক্ষয় প্রতিরোধ ক্ষমতা উন্নত করে। সুশ্রুত রোগ প্রতিরোধে শ্লোক রচনা করেছেন।

৪০৩.১.১০ মানব কঙ্গালতন্ত্র

সুশ্রুত সংহিতার শরীরস্থানের ৫ম অধ্যায়ে বলা হয়েছে, 'আয়ুর্বেদবাদীরা বলেন যে, অস্থির সংখ্যা তিনশত ছয়। কিন্তু এই শল্যতন্ত্রে তিনশত অস্থিই বলা হয়েছে'। ডাক্তার ওয়াইজ বলেন যে, তরুণাস্থি ও অস্থি একত্র ধরিয়া ৩০৬টি অস্থি বলা হয়েছে। অতঃপর পাঠ্যটিতে মোট ৩০০টি অস্থির একটি তালিকা বর্ণনা করা হয়েছে। ১২০টি অস্থি রয়েছে শরীরের শাখাসমূহে (হস্ত ও পাদদ্বয়ে), ১১৭টি অস্থি রয়েছে শ্রোণী, পার্শ্বে, পৃষ্ঠে, উদরে ও বক্ষে এবং ৬৩টি অস্থি গ্রীবার উর্দভাগে। এই অস্থিসমূহকে ৫টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে কপালাস্থি, রুচক-অস্থি, তরুণ-অস্থি, বলয়-অস্থি এবং নলক-অস্থি।পাঠ্যটি তখন ব্যাখ্যা করে যে কীভাবে এই সাবটোটালগুলি পরীক্ষামূলকভাবে যাচাই করা হয়েছিল। বিষয়বস্তুটি থেকে বুঝা যায়, ভারতীয় ঐতিহ্য চিন্তার

বৈচিত্র্যকে লালন করে, সুশ্রুত বিদ্যালয়ের নিজস্ব সিদ্ধান্তে পৌঁছে এবং আত্রেয়-কারক ঐতিহ্য থেকে ভিন্ন।

সুশ্রুতের অস্টিওলজিক্যাল সিস্টেম, হোর্নেল বলেন, হোমোলজির নীতি অনুসরণ করে, যেখানে শরীর এবং অঙ্গগুলিকে স্ব-প্রতিফলন হিসাবে দেখা হয় এবং প্রতিসাম্যের বিভিন্ন অক্ষের সাথে সম্পর্কিত।দুটি বিদ্যালয়ে হাড়ের গণনার পার্থক্য আংশিক কারণ চরক সংহিতা তার গণনায় বত্রিশটি দাঁতের সকেট অন্তর্ভুক্ত করে এবং কীভাবে এবং কখন একটি তরুণাস্থিকে হাড় হিসাবে গণনা করা যায় সে সম্পর্কে তাদের মতামতের পার্থক্য (উভয়ই তরুণাস্থিকে হাড় হিসাবে গণনা করে, বর্তমান চিকিৎসা অনুশীলনের বিপরীতে)।

সুশ্রুত সংহিতা অস্ত্রোপচারের পদ্ধতি এবং আলোচনার জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত। এটি মানব ইতিহাসের প্রথম একটি ছিল যে পরামর্শ দেয় যে অস্ত্রোপচারের একজন ছাত্রকে একটি মৃতদেহ ছিন্ন করে মানবদেহ এবং এর অঙ্গগুলি সম্পর্কে শিখতে হবে। একজন শিক্ষার্থীর অনুশীলন করা উচিত, পাঠ্যটি বলে, রোগাক্রান্ত বা শরীরের অংশের অনুরূপ বস্তুর উপর। উদাহরণস্বরূপ, পুষ্পফালা (স্কোয়াশ, কুকুরবিটা *ম্যাক্সিমা*), *আলাবু* (বোতল গার্ড, ল্যাজেনারিয়া *ভালগারিস*), ট্রাপুশা (শসা, কুকুমিস *পিউবেসেন্স*), তরল এবং মৃত প্রাণীর মূত্রাশয় ভরা চামড়ার ব্যাগগুলির উপর ছেদ গবেষণার সুপারিশ করা হয়। প্রাচীন পাঠ্য, রাজ্য মেনন এবং হাবারম্যান বর্ণনা করেছেন রক্তক্ষরণ, বিচ্ছেদ, প্লাস্টিক, রাইনোপ্লাস্টিক, চক্ষু, লিথোটমিক এবং প্রসূতি পদ্ধতি।

সুশ্রুত সংহিতা স্লাইডিং গ্রাফ, রোটেশন গ্রাফ এবং পেডিকল গ্রাফ সহ বিভিন্ন পদ্ধতির উল্লেখ করেছে। একটি নাক (রাইনোপ্লাস্টি) যা কেটে ফেলা হয়েছে তার পুনর্গঠন, গাল থেকে চামড়ার ফ্ল্যাপ ব্যবহার করেও বর্ণনা করা হয়েছে। ল্যাবিওপ্লাস্টিও সমাহিতায় মনোযোগ পেয়েছে।

৪০৩.১.১১ ভেষজ ঔষধি

সুশ্রুত সংহিতা, সংস্কৃত ঔষধ-সম্পর্কিত ক্লাসিক অথর্ববেদ এবং চরক সংহিতা সহ, একসাথে ৭০০টিরও বেশি ভেষজ ঔষধির বর্ণনা করে। বর্ণনা, পদ্মা জানায়, নিরাপত্তা, কার্যকারিতা, ডোজ এবং সুবিধার জন্য তাদের স্বাদ, চেহারা এবং হজমের প্রভাব অন্তর্ভুক্ত করে।

৪০৩.১.১১ রাইনোপ্লাস্টি

রাইনোপ্লাস্টি, কথোপকথনে "নাকের কাজ" নামে পরিচিত, দুটি ফলাফল অর্জনের জন্য একটি অস্ত্রোপচার করা হয় :

- নাকের শ্বাস-প্রশ্বাসের কার্যকারিতা উন্নত করতে
- নাকের প্রসাধনী চেহারা উন্নত করতে

সুশ্রুতের গ্রন্থটি **গাল ফ্ল্যাপ রাইনোপ্লাস্টির প্রথম লিখিত রেকর্ড সরবরাহ করে, একটি কৌশল যা আজও একটি নাক পুনর্গঠনের জন্য ব্যবহৃত হয়।** পাঠ্যটি এটি মেরামত করার জন্য ১৫টিরও বেশি পদ্ধতি উল্লেখ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে গাল থেকে চামড়ার ফ্ল্যাপ ব্যবহার করা, যা আজকের সবচেয়ে আধুনিক প্রযুক্তির মতো।

ভারতীয় সমাজে নাক প্রাচীনকাল জুড়েই মর্যাদা ও সম্মানের প্রতীক হয়ে আছে। রাইনোপ্লাস্টি ভারতে

একটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিকাশ ছিল কারণ শাস্তির একটি রূপ হিসাবে নাক কেটে ফেলার দীর্ঘস্থায়ী ঐতিহ্য। দোষী সাব্যস্ত অপরাধীরা প্রায়শই তাদের অবিশ্বস্ত হিসাবে চিহ্নিত করার জন্য তাদের নাক কেটে ফেলত, তবে ব্যভিচারের অভিযোগে অভিযুক্ত মহিলাদের উপরও প্রায়শই অঙ্গচ্ছেদ করা হয়-এমনকি তারা দোষী প্রমাণিত না হলেও। একবার এই শাস্তি হয়ে গেলে, একজন ব্যক্তিকে তার বাকী জীবন কলঙ্কের সাথে বাঁচতে হয়েছিল। পুনর্গঠনমূলক অস্ত্রোপচার, তাই, পরিত্রাণ এবং স্বাভাবিকতার আশা প্রদান করে।

বাহ্যিক নাক পুনর্গঠনের প্রয়োজনের ফলে রাইনোপ্লাস্টির অনুশীলন ধীরে ধীরে শুরু হয় এবং পরে পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানে বিকশিত হয়।

৪০৩.১.১২ Medicine in medieval and preéŸécolonial India

চিকিৎসা মানুষের মৌলিক প্রয়োজন। মানুষের শরীর, মন ও মানসিকতার সঙ্গে চিকিৎসার সম্পর্ক। প্রয়োজনে মানুষকে চিকিৎসাপদ্ধতির দ্বারস্থ হতে হয়। অসুস্থ ব্যক্তির রোগের ধরন আবিষ্কার করে নিয়ামক বা পথ্যের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হয়। আদিম যুগে মানুষ যখন অসুস্থ হতো, তখন তারা বিভিন্ন পদ্ধতিতে সুস্থ হওয়ার চেষ্টা করেছে। রোগীর বাড়তি সেবাযত্ন নিয়েছে। ঘরোয়া পরিবেশে সেবা দিয়েছে। বর্তমান সময়ের মতো তদানীন্তন, পৃথিবীতে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা হয়নি। ঘরই ছিল মানুষের হাসপাতাল। সেই আমলে রোগীর জন্য কেউ আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করত। রোগীর অবস্থা জটিলকঠিন হলে ধর্মীয় মনীষীর শিরির বা আশ্রমে ধরনা দিত। কখনো রোগীকে সেখানে রাখা হতো। গ্রিক, রোমান ও মিসরীয় সভ্যতায় চিকিৎসাশাস্ত্রের কিছুটা উন্নতি হয়। তবে চিকিৎসাশাস্ত্রের পরিপূর্ণ যৌবন রচিত হয় মধ্যযুগে মুসলমান শাসক ও বিজ্ঞানীদের কল্যাণে।

আলোচ্য পর্বে ভারতবর্ষে অনেক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এসব হাসপাতালে সব ধরনের চিকিৎসাসরঞ্জাম, ওষুধ-পথ্য মজুদ থাকত। অন্যান্য চিকিৎসা বিভাগের সঙ্গে অস্ত্রোপচারের আলাদা বিভাগ ছিল। শরীরের বিভিন্ন স্থানে অস্ত্রোপচারের জন্য ছিল আলাদা সার্জন।

ভারতে মুসলিম শাসকদের মধ্যে ফিরোজ শাহ তুঘলক (৭৫২ হিজরি) একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। এই হাসপাতালকে তখন "সিহহতখানা" বলা হতো। সুলতান হাসপাতালে কয়েকজন চিকিৎসক নিয়োগ দেন। হাসপাতালের পক্ষ থেকে রোগীদের খাবার সরবরাহ করা হতো। সুলতান বেশ কিছু জমি হাসপাতালের ব্যয় বহনের জন্য হাসপাতালের নামে ওয়াকফকরে দেন। তারিখে ফিরোজশাহিতে শুধু একটি হাসপাতালের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু ঐতিহাসিক আবুল কাসেম ফেরেশতা লিখেছেন, সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক মোট পাঁচটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন।

আহমেদাবাদে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন সুলতান আলাউদ্দিন বিন সুলতান আহমদ শাহ বাহামানি (মৃত্যু : ৭৫৭ হিজরি)। এই হাসপাতালের ব্যয়ের জন্যও সুলতানের ওয়াকফ করা জমি ছিল। ৮৪৯ হিজরিতে মালোয়ার শাসক মাহমুদ খিলজি শাদিআবাদে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। হেকিম মাওলানা ফজলুল্লাহকে পাগলদের চিকিৎসা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়।

মুঘল বাদশাহদের মধ্যে জাহাঙ্গীর সর্বপ্রথম হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হন। গুরুত্বের সঙ্গে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেন। সেকালের একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক হেকিম আলী প্রতিবছর দরিদ্রদের

মধ্যে প্রায় ছয় হাজার ওষুধ বিলি করতেন। মুঘল সম্রাট আকবরও অনেক সরাইখানা নির্মাণ করেন। সেখানে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল কোথাও কোথাও। তাঁর অধীনে মন্ত্রীরা, বিভিন্ন আমলাও সরাইখানা তৈরি করেন।

মুঘল ভারতে ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে বিপুল পারসি পুঁথি রচিত হয়। সুলতানি সময় থেকে এই কাজটি উর্দু ভাষায় শুরু হয় এবং ধারাবাহিকভাবে চলে ব্রিটিশ আমলের আগে পর্যন্ত। উর্দু আর ফারসি ভাষায় ইসলাম-পূর্ব সময়ের চিকিৎসা শাস্ত্র এবং বিজ্ঞান বিষয়ক শাস্ত্র অনুবাদ মুঘল আমলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্ম বলে আজও বিবেচিত হয়। বিশেষ করে চিকিৎসা শাস্ত্র/জ্ঞান অনুবাদের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় ভাষায় বিদেশি ওষুধ, গাছগাছনার প্রতিস্থাপনের দেশিয় জ্ঞান অর্জন। ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ে পারসি পুঁথি লেখেন শিবাজীর সমসাময়িক চিকিৎসক আমন আল্লা হান। তিনি মদনবিনোদ-রে অনুবাদ করেন। কয়েকটিতে ঔরঙ্গজেবের নাম জোড়া হয়, যেমন দারউইস মহম্মদের চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ে কাজ তিব্বিআউরঙ্গশাহী।

ভারতে মধ্যযুগের ইতিহাসের দেখা যায় ডাক্তারির পেশা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। আবুল ফজল, নিজামুদ্দিন আহমেদ এবং লাহোরি ওই সময়কার উলেমা (গবেষক) এবং কবিদের তালিকা তৈরি করার সময় ডাক্তারদেরও সেই তালিকায় যুক্ত করেছিলেন। এই ডাক্তাররা যুক্ত ছিলেন মুঘল বাদশাহদের সভায়। আকবরের আমল (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রী.) থেকেই এই প্রবণতা শুরু হয়।

কিন্তু এই রাজকীয় কাজে যোগ দেওয়া সহজ ছিল না। ডাক্তারদের এই কাজে যোগ দেওয়ার আগে নিয়োগকর্তার করা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হত। রাজা-মহারাজা সন্তুষ্ট হলে তবেই না চাকরি। সবচেয়ে যোগ্য এবং অভিজ্ঞ ডাক্তারকে বেছে নেওয়ার জন্য কড়া পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হত। মাসিরুল-উমারা থেকে জানা যায়, হাকিম আলি গিলানির নিযুক্তির সময় আকবর বেশ কিছু বোতলে নানারকম তরল ভরে পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। সেই সব বোতলের কোনটায় ছিল সুস্থ মানুষের প্রস্রাব, কোনটায় অসুস্থ মানুষের প্রজাব। আবর কোনটায় গরু বা গাধার প্রস্রাব। হাকিম নাকি সঠিকভাবে সনাক্ত করতে পেরেছিলেন এবং সসম্মানে শাসকের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। সেই সময় থেকেই গিলানির নামডাক বাড়তে থাকে। তিনি আকবরের খুবই ঘনিষ্ঠ হন। এ থেকেই বোঝা যায় সেই সময় বিকারতত্ত্ব বা প্যাথোলজি কতটা উন্নত ছিল। একই রকম ঘটনা শাহ আলমের আমলেও ঘটেছিল বলে মানুচি জানিয়েছেন।

মানুচির মন্তব্য থেকে জানা যায়, ডাক্তারদের "সাম্রাজ্যিক কৃত্যক"-এ কে ধরনের ক্রমোচ্চশীল ব্যবস্থা ছিল। সবচেয়ে ওপরে থাকতেন মুখ্য ডাক্তার, যাঁর অধীনে থাকতেন বেশ কয়েকজন ডাক্তার, যাঁরা তাঁর আদেশ পালন করতেন। মুঘল যুগে এই মুখ্য ডাক্তারের নাম ছিল সারমদ-ই-অভিব্বা বা সরমদ-ই-হুকুম। আর রাজপরিবারের মুখ্য ডাক্তার ছিলেন "হাকিমুল মুলক", যাঁরা একরকম স্বাধীনভাবে মনসব ভোগ করতেন। আকবরের আমলে সবচেয়ে পরিচিত চিকিৎসক, যিনি সবচেয়ে বড়ো মনসবদারি ভোগ করতেন তিনি হলেন হাকিম আবুল ফাথ। যার "হাকিমুল মুলক" ছিলেন হাকিম শামসুদ্দিন গিলানি। ১৬২৯-এ শাহজাহান শাসক হওয়ার পর এই শামসুদ্দিন গিলানর ছেলে হাকিম আবুল কাশিম হন "হাকিমূল মূলক"। এরপরে এই পদে অভিষিক্ত হন হাকিম মির মুহাম্মদ মাহদি আরদিস্তানি, পরে হাকিম সাদিক খান।

মুঘল চিত্রশিল্পেও চিকিৎসকদের এই ক্রমোচ্চশীলতার ছাপ মেলে। সেখানে ভাগ ছিল এরকম রাজার ডাক্তার, যুবরাজের ডাক্তার, অভিজাতদের ডাক্তার। দু-তিনটে ছবিতে দেখা যায় মুখ্য ডাক্তার তাঁর অধীনস্থ

চিকিৎসকদের সঙ্গে নিয়ে রোগীর চিকিৎসা করছেন। ডাক্তারদের ক্ষমতার বৃত্তে প্রবেশের বৃত্তান্ত মেলে নানান উপাদনে। অনেকেই বড়ো বড়ো মনসবের ভাগ পেতেন। আর যাঁরা এই মনসবদার হতেন না, তাঁদের দেওয়া হত দৈনিক বা বাষিক বেতন। আবার মনসব দেওয়ার পরও তাঁদের "জার-ই-জেব" বা "পকেটমানি" দেওয়া হত জরুরি ওষুধপত্র সঙ্গে রাখার জন্য। যোগ্য ডাক্তারই তো আসল ডাক্তার।

খাস শাসকের চিকিৎসক হলেও খাস অন্দরমহলে প্রবেশের অধিকার সহজ ছিল না। মানুচি লিখেছেন, রাজকীয় "হারেম" বা আমীরদের "হারেম"-এ প্রবেশের আগে চিকিৎসকের গা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা কাপড়ে ঢেকে দেওয়া হত আর তাকে হারেমে সঙ্গে করে নিয়ে যেত খোজারা (unach)। হারেমের মধ্যে রাজপরিবারের অসুস্থ নারীর চিকিৎসার জন্য একটা "বিমারখানা" থাকত। রাজ পরিবারের কারুর চিকিৎসা শুরু করার আগে শাসকের অনুমতি লাগত। শাসক সব সময়ই ভয়ে থাকতেন। চিকিৎসককেও বিশ্বাস করা কঠিন ছিল। ভয় ছিল ষড়যন্ত্রের। অসুস্থ চিকিৎসকের চিকিৎসার অনুমতি মেলেনি, এমন উদাহরণও আছে। ১৬৮৩-তে চিকিৎসক দিলের খান অসুস্থ হয়ে পড়লে সম্রাট শাহ আলম তাঁর চিকিৎসার অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন। কাজেই মুঘল যুগে সম্রাটরা শুধু আসল বা নকল ডাক্তার নির্ধারণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না। যোগ্যতার পাশাপাশি বিবেচ্য ছিল বিশ্বস্ততা।

আর বিশ্বস্ত, যোগ্য চিকিৎসকের ওপর শাসক ও আমীর ওমরাহরা খুব নির্ভরও করতেন। জাহাঙ্গীরের সঙ্গে তাঁর চিকিৎসকের সম্পর্ক ছিল খুবই ভাল। তবে সেখানেও যোগ্যতার মাপকাঠি ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। চিকিৎসকদের কাজ এবং দক্ষ চিকিৎসকদের ভৎসনা-অপমান করতেন। তাঁর রোগ সারাতে না পারায় তিনি এক চিকিৎসককে কোনও না কোনও অজুহাতে পদচ্যুত করনে। অর্থাৎ রাজার অসুখ সারানোটাই চিকিৎসকের যোগ্যতার নির্ধারক ছিল। তবে সবটাই তো বিশ্বাস আর নির্ভরতার ব্যাপার। কোনও অসৎ চিকিৎসককে পদচ্যুত করার পরও শাসক নিজের প্রয়োজনে আবার তাঁর শরণাপন্ন হয়েছেন, এমন উদাহরণও আছে। আবার মুঘল যুগের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি-ষড়যন্ত্রের প্রভাবও পড়ত চিকিৎসকদের ওপর। হাকিম তাকাররুব খানের অবসরের পর বন্দী শাহজাহানকে চিকিৎসা করতে সারিয়ে তোলার "অপরাধ"-এ তাঁর ছেলেকে আওরঙ্গজেব হাকিম পদ তেকে অপসারিত করেন। পরে আওরঙ্গজেব নিজে অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি সেই হাকিমেরই শরণাপন্ন হন, উঠে যায় পদচ্যুতির আদেশ।

এক চিকিৎসক রাজা বা অভিজাতের চিকিৎসক হিসাবে কাজে যোগ দিলেও তিনি সারাজীবন তাদের অধীনে কাজ করতে বাধ্য ছিলেন না। সত্যিকারের পেশাদারের মতো তিনি তাঁর ইচ্ছেমত নিয়োগকর্তা বদল করেত পারতেন। তবে শাসকের সন্দেহ আর ষড়যন্ত্রের ভয় কিন্তু সবসময়ই সঙ্গী ছিল। শাসকরাও চিকিৎসকের যোগ্যতায় মুগ্ধ হয়ে নানান পুরস্কার দিতেন। ১৬১৮-তে হাকিম রুহুল্লাহ, নূরজাহান বেগমের অসুখ নিরাময় করার পুরস্কার হিসেবে লাভ করেন তাঁর দেশের বাড়ির একটি গ্রাম যা চিহ্নিত হয় "মাদাদ-ই-মাস" নামে যা চিল তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তির মত। চিকিৎসকের এই স্বীকৃতি লাভে তাদের চিকিৎসার দক্ষতাই কেমাত্র বিবেচ্য ছিল। কোনও ধর্মগত বা ভাষা ও গোষ্ঠীগত পরিচয়।

"দারুশ-শিফা" বা "শিফাখানা" অর্থাৎ হাসপাতাল গড়ে উঠেছিল মুখল আমলে। মূলত জাহাঙ্গীরের শাসনকাল থেকে গড়ে ওঠো এই হাসপাতালে চিকিৎসকদের দৈনিক ভাতা দেওয়া হত সরকারি তহবিল থেকে। আওরঙ্গজেবের সময়কালের কাগজপত্র থেকে জানা যায় ঔরঙ্গবাদের এক সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাঁদের কাজের জন্য পেতেন দৈনিক ছ' টাকা অর্থাৎ মাসিক ১৮০ ট্যাক। তবে শাসককে প্রদেয় অর্থ কেটে

নেওয়ার পর চিকিৎসক হাতে পেতেন মোট ১৩৬ টাকা। এই অল্প পারিশ্রমিকে কী আর যোগ্য চিকিৎসক মিলত যেখানে সম্রাট বা অভিজাতর চিকিৎসক হলে পাওয়া যেত এর কয়েকগুণ বেশি অর্থ!

চিকিৎসকদের কাজের কিন্তু অন্ত ছিল না। শুধু রোগ নির্ণয় এবং তা নিরাময়ের জন্য চিকিৎসা করা নয় তাঁকে ওষুধও তৈরি করতে হত। মনে করা হত যে ওষুধ তিনি রুগীকে খেতে দিচ্ছেন তা তৈরি করে দেওয়াটাও তাঁরই কাজ। ফলে "ফার্মাসিস্ট"-এর কাজও করতে হত ডাক্তারকে। তাঁরই তত্ত্বাবধানে তৈরি হত ওষধি গুঁড়ো, তরল (শরবত, আরক) ইত্যাদি। মুঘল আমলে ডাক্তারির নানান অগ্রগতি ঘটেছিল। মেডিসিন, সার্জারি, চক্ষু চিকিৎসা ইত্যাদি। লেখা হয়েছিল এইসব বিষয়ে বইপত্রও। ইউরোপের চিকিৎসাবিদ্যার বইয়ের অনুবাদও হয়েছিল। উইলিয়াম হারভের রক্তসংবহনতন্ত্রর তত্ত্বও এ দেশের চিকিৎসকদের অজানা ছিল না।

এইসব যোগ্য চিকিৎসকরা সবাই যে শাসকবর্গর চিকিৎসা বা শাসক প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালে চিকিৎসা করেই জীবন কাটিয়ে দিতেন তা নয়। অর্থ-নিরাপত্তা আর পদপ্রাপ্তিই তো সব নয়। বিষয়ের প্রতি অনুরাগ থেকে এঁরা শুরু করতেন "প্রাইভেট প্র্যাকটিস"।

এঁদের বলা হত "মুতাতাবিব-সিরহিন্দি" বা বাজার-ডাক্তার। শাসক বা আমীর ওমরাহদের চিকিৎসা করলে অর্থ মিলত বটে কিন্তু চিকিৎসা করার পরিসর সঙ্কুচিত হয়ে যেত। ডাক্তার যদি ডাক্তারিই না করতে পারেন তবে আর "কাজ" করে লাভ কী। এই ভাবনা থেকে যোগ্য ডাক্তাররা "প্রাইভেট প্র্যাকটিস" করতেন। আর এখানেই শুরু হত আসল ডাক্তার আর নকল ডাক্তারের দ্বন্দ্ব। রাজার ডাক্তার হওয়ার সময় না হয় ভালরকম "পরীক্ষা" দিয়ে চাকরি পেতে হত কিন্তু "বাজার-চিকিৎসক" যোগ্য না অযোগ্য, আসল না নকর-সে বিচার কে করবে। স্বভাবতই জাল ডাক্তার ছেয়ে গিয়েছিল বাজারে। বাদাউনি জানিয়েছেন এমন বহু চিকিৎসক বাজারে মিলত যারা হাতুড়ে বা কোয়াক ডাক্তার ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুচিও লিখেছেন অসংখ্য জালিয়াত ডাক্তারের কথা, যাঁরা বিভিন্ন সরাইতে ডাক্তারির নামে পর্যটকদের ঠকাতেন। এই বাজার-চিকিৎসকদের মধ্যে যোগ্য লোককে খুঁজে পাওয়া সহজ ছিল না।

৪০৩.১.১৩ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১) What do you mean by preventive and curative medicine? What is there importance?

২) Write a short note on Ancient Indian Medicine with special reference to Susruta.

৩) Discuss the growthg of medicine in Medieval India.

পর্যায়-২

একক-০

বিন্যাসক্রম

৪০৩.১.১ উদ্দেশ্য

৪০৩.১.২ 1

৪০৩.১.৩ ১

৪০৩.২.৩ Indigenous systems of medicine-*Ayurveda, Unani etc.*

ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা বিজ্ঞান হল Traditional Medicine হিসেবে ব্যবহৃত বিশ্বের প্রাচীন ও বহুল ব্যবহৃত দুটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের নাম। World Health Organization (WHO)-এর মতে, Traditional Medicine হচ্ছে-"The health practices, approaches, knowledge and beliefs incorporating plant, animal and mineral-based medicines, spiritual therapics, manual techniques and exercies, applied singularly or in combination to treat, diagnose and prevent illnesses or maintain well-being." অর্থাৎ উদ্ভিজ, প্রাণিজ ও খনিজ উপাদানের একক অথবা যৌগিক প্রয়োগ বা ব্যায়াম অথবা খাদ্যভ্যাস পরিবর্তনের মাধ্যমে রোগ নির্ণয়, রোগ নিরাময়, রোগ প্রতিরোধ অথবা সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার চিকিৎসা ব্যবস্থা, পদ্ধতি, জ্ঞান এবং ধ্যান ধারণা ও বিশ্বাসের সমন্বয়কে Traditional Medicne বলা হয়। সহজ কথায়, বিশ্বের বিভিন্ন জাতি বা গোষ্ঠী কর্তৃক ব্যবহৃত তাদের নিজস্ব জ্ঞান প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাপ্ত চিকিৎসা পদ্ধতিকে Traditional Medicine বলা হয়ে থাকে। ইউনানী চিকিৎসার উৎপত্তি ঘটেছিল গ্রীস শহরে, আর আয়ুর্বেদের উৎপত্তি ভারত উপমহাদেশে। ইতিহাস থেকে যা জানা যায়, সর্বপ্রথম চিকিৎসা বিজ্ঞানের সূচনা ঘটে বাবেল তথা ব্যাবিলনে (ইরাক)। পরবর্তীতে মিশর এবং তারপর ভারত উপমহাদেশ ও চীনে চিকিৎসা বিজ্ঞানের চর্চা আরম্ভ হয়। কালের পরিক্রমায় বাবেল ও মিশর ধ্বংসের পর বাবেলীয় ও মিশরীয় চিকিৎসা সভ্যতা স্থানান্তরিত হয়ে গ্রীসের ইউনানা নামক প্রদেশে ইউনানী চিকিৎসা নামে আত্মপ্রকাশ করে। সময়ের সাথে সাথে ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা বিজ্ঞান দুটি আলাদা কেন্দ্র থেকে তাদের আবিষ্কার, মানব কল্যাণে প্রয়োগ অব্যাহত রাখে এবং মুসলমানদের মাধ্যমে ইউনানী চিকিৎসা বিজ্ঞান উপমহাদেশে প্রবেশ করে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে।

মানুষের ইতিহাস যতদিনের রোগের ইতিহাসও তার সমসাময়িক। সেই সাথে এও দেখা গেছে সর্বত্রই মানুষ এই রোগ মোকাবিলার নানা পন্থা অবলম্বন করেছেন। রোগ নিরাময়ের এই ব্যবস্থা দুইটি বৈশিষ্ট্য লক্ষা করা যায়। একটা হচ্ছে স্থানীয় প্রকৃতির নানা উপাদানের উপর এবং দ্বিতীয়ত রোগমুক্তির পুরো প্রক্রিয়াটি প্রভাবিত হয়েছে স্থানীয় ধার্মিক এবং সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল দিয়ে। ফলে চিকিৎসা ব্যাপারটা হয়ে উঠেছে জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক এই দুইয়ের সমন্বিত কর্মকাণ্ড। একটা ধর্মীয় ও সংস্ককৃতির কাঠামোর ভিতর দিয়েই

মানব সভ্যতার বিভিন্ন অঞ্চলের রোগ নির্ণয়ের পদ্ধতি, চিকিৎসার নানা স্বতন্ত্র গড়ে ওঠে। এই ধারাগুলোর অন্যতম হচ্ছে ভারতীয় আয়ুর্বেদ।

'আয়ু' শব্দের অর্থে 'জীবন' এবং 'বের্দ' শব্দের অর্থ 'জ্ঞান' বা 'বিদ্যা'। 'আয়ুর্বেদ' শব্দের অর্থ জীবনজ্ঞান বা জীববিদ্যা। অর্থাৎ যে জ্ঞানের মাধ্যমে জীবের কল্যাণ সাধন হয় তাকে **আয়ুর্বেদ** বা জীববিদ্যা বলা হয়। আয়ুর্বেদ চিকিৎসা বলতে ভেষজ বা উদ্ভিদের মাধ্যমে যে চিকিৎসা দেয়া হয় তাকে বুঝানো হয়। এই চিকিৎসা ৫০০০ বছরের পুরাতন। পবিত্র বেদ-এর একটি ভাগ-অথর্ববেদ-রে যে অংশে চিকিৎসা বিদ্যা বর্ণিত আছে তাই আয়ুর্বেদ। আদি যুগে গাছপালার মাধ্যমেই মানুষের রোগের চিকিৎসা করা হত। এই চিকিৎসা বর্তমানে 'হরবাল চিকিৎসা' তথা 'অলটারনেটিভ ট্রিটমেন্ট' নামে পরিচিতি লাভ করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানে এই চিকিৎসা বেশী প্রচলিত। পাশাপাশি উন্নত বিশ্বেও এই চিকিৎসা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কারণ মর্ডান এলোপ্যাথি অনেক ওষধেরই side effect বা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া রয়েছে। যেমন—ঔষধ সিপ্রোপ্লাক্রাসিন, ফ্লুক্লক্রাসিলিন, মেট্রোনিডাজল, ক্লক্রাসিলিন প্রভৃতি ঔষধ রোগ সারানোর পাশাপাশি মানব শরীরকে দুর্বল করে ফেলে এবং দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে স্মৃতিশক্তি, যৌনশক্তি, কর্মক্ষমতা কমে যাওয়ার ইতিহাস পাওয়া যায়। কিন্তু তবুও দ্রুত আরোগ্য লাভের জন্য মানুষ এগুলো ব্যবহার করে চলেছে। পক্ষান্তরে ডাক্তারও ঔষধ ব্যবসায়ীগণ এসকল সাইড এফেক্ট পরওয়া না করে সুনামের জন্য অনবরত দেদারছে রোগীদেরকে এসকল ঔষধ দিয়ে যাচ্ছেন। তাই এখন এ ঔষধের বিকল্প ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া মুক্ত হিসেবে বিশ্বে এখন ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

প্রাচীন ভারতের অন্যতম চিকিৎসা পদ্ধতি ছিল আয়ুর্বেদ। সেই সূত্রে বলা বাহুল্য, প্রাচীন বাংলাতেও আয়ুর্বেদই ছিল চিকিৎসার মূল ধারা। আয়ুর্বেদ মূলত একটি ধর্মগ্রন্থই। বেদ শাস্ত্রেরই একটি শাখা এটি। আয়ু বৃদ্ধির বেদ। হিন্দু পুরানে দেবতাদের চিকিৎসক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে 'ধন্বন্তরীকে'। তাকেই বিবেচনা করা হত আয়ুর্বেদের জনক হিসেবে। ভারতবর্ষের আয়ুর্বেদ চিকিৎসার ইতিহাস দু' হাজারের বছরেরও অধিক। কথিত আছে আয়ুর্বেদের মূল নীতিগুলো পদ্ধতি আকারে সংরক্ষণ করেছিলেন 'কনিষ্ক' রাজার চিকিৎসক 'চরক'। যা 'চরক সংহিতা' নামে বিখ্যাত। আয়ুর্বেদ মনে করে দেহের ভিতরের বিভিন্ন উপাদানের ভারসাম্যহীনতাই তৈরী করে রোগ। আয়ুর্বেদ চিকিৎসার মূল লক্ষ্য হচ্ছে শরীরের সেই ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা। ঔষধ পথ্য ও জীবনযাপনের নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলে আয়ুর্বেদের চিকিৎসা। ঔষধের উৎস হচ্ছে ভেষজ উদ্ভিদ আর জীবনযাপনের অভ্যাসের মধ্যে রয়েছে যোগব্যায়াম, ধ্যান সহ নানা চর্চা। ধারণা করা হয় বৌদ্ধ দর্শনের নানা উপাদান আয়ুর্বেদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিশেষ করে ধ্যান মগ্ন হওয়াকে আয়ুর্বেদ চিকিৎসার অংশ হবার পিছনে বৌদ্ধ ভিক্ষুকের ভূমিকা আছে বলে মনে করা হয়। আয়ুর্বেদ সম্পর্কে এতটুকু নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, হাজার বছর আগে মানুষের দেহ রোগকে বুঝার যে চেষ্টা আয়ুর্বেদে হয়েছে তা এখনো প্রাসঙ্গিক। বিশেষ করে মানুষের দেহকে মহাবিশ্বে একটা অংশ হিসেবে দেখবার একটা দৃষ্টিভঙ্গী, কিম্বা দেহ ও অনুভূ তির সমন্বত চিকিৎসা আধুনিক যুগেও নানা ভাবে সমাদৃত। চিকিৎসা হিসেবে ধ্যান বা মেডীটেশন নতুন করে সমাদৃত হয়ে উঠেছে সারা পৃথিবীতে। উল্লেখ্য প্রাচীন ভারতে বিশেষ করে বাংলা অঞ্চলে শল্য চিকিৎসার ও ব্যাপক প্রসারের খোঁজ পাওয়া যায়। চরকের মতে 'সুশ্রুত' নামের একজন শল্য চিকিৎসক সশ্রত সঙ্খিতা রচনা করেন। যিনি কাশীর অধিবাসী ছিলেন বলে ধারণা করা যায়। তাকে ভারতবর্ষের সার্জারীর জনক বলে বিবেচনা করা হয়। বিপ্লবের ব্যাপার হচ্ছে 'সুশ্রুত সংহিতা' তাঁর বইয়ের অসংখ্য সার্জারীর প্রক্রিয়ার বর্ণনা

দিয়ে গেছে। সেই সঙ্গে দিয়ে গেছেন অসংখ্য সার্জিকাল যন্ত্রপাতির বিবরণ। কামারদের কাছ থেকে কি করে অতি সূক্ষ্ম সেইসব যন্ত্রগুলো বানিয়ে নিতে হবে তারও বিবরণ আছে সেই বইয়ে।

তবে আয়ুর্বেদ মনে করে মানুষের জীবন-দেহ, অনুভূতি ও আত্মার একটা সমন্বয়। মানুষের শরীরের ধাতুগুলো—রস, রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা, মেদ ও শুক্র নানা কারণে ভারসাম্যহীনতায় পড়তে পারে। তাই ভেষজ ঔষধ, নানাবিধ খাদ্য ও জীবনযাপনের অভ্যাস পরিবর্তনের (যোগ ব্যায়াম, ধ্যান) ইত্যাদির মাধ্যমে আমরা পেতে পারি সুস্থ ও সাফল্যমণ্ডিত দীর্ঘ জীবন।

ইউনানী শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ 'lwvia' (lonia) অথবা 'lwvin' (lonie) থেকে, যা হিপোক্রিটাস এর জন্মস্থানের নাম। ইউনানী এক ধরনের ঐতিহ্যগত (traditional) চিকিৎসা পদ্ধতি, যা গ্রিক, মুসলমান এবং স্পেনীয়দের (আরব-স্প্যানিশ) মধ্যে বেশি বিকাশ লাভ করে। হিপোক্রেটিস, ইবনে সিনা, জালিনুস প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ ইউনানী চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রবর্তক। গ্রীসের ইউনান প্রদেশ হতে এ চিকিৎসা বিজ্ঞানের যাত্রা শুরু বলে এই পদ্ধতিকে বলা হয় ইউনানী চিকিৎসা পদ্ধতি। ইউনানী ঔষধ চারটি মানসিক অবস্থার (Mi'zaj) ধারণার ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে : ফেল্ম (Bulgham-বালঘাম), রক্ত (Dum-দাম), হলুদ পিত্ত (yellow bile) (Safra-সাফ্রা) এবং কালে (black bile) (Sauda-সাউদা)। এই চিকিৎসা পদ্ধতির উপর ভারতীয় চৈনিক প্রাচীন ঐতিহ্যগত চিকিৎসার প্রভাবও বিদ্যমান।

এই ব্যবস্থায় রোগ প্রতিরোধে ছয়টি পূর্বশর্তের (আসহাব-ই-সিত্তা যারুরীয়্যাহ্) উপর নির্ভর করা হয় :

১-বায়ু;

২-খাদ্য এবং পানি;

৩-দৈহিক গতিবিধি এবং প্রতিক্রিয়া;

৪-শারীরিক গতিবিধি এবং প্রতিক্রিয়া;

৫-নিদ্রা ও অনিদ্রা এবং

৬-রেচন ও স্মৃতিশক্তি।

ইউনানী ও আয়ুর্বেদের মধ্যে পার্থক্য কি? এই প্রশ্নের প্রচলিত উত্তর হল-যাহা জল তাহাই পানি অর্থায ইউনানী ও আয়ুর্বেদের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। আসলে কি তাই? ইতিহাস থেকে আমরা খুব সহজেই তিনটি পার্থক্য পেয়ে গিয়েছি...(১) ইউনানী চিকিৎসা বিজ্ঞান ইউনানী চিকিৎসা নামকরণ হয় গ্রীসের ইউনান নামক প্রদেশের নামে আর আয়ুর্বেদ হল আর্যদের ধর্মগ্রন্থের নাম। (২) আয়ুর্বেদ মতে পঞ্চভূত তথা ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম এর সমন্বয়ে প্রকৃতি জড়, জীব ও উদ্ভিদ জগৎ সৃষ্টি হয়েছে আর ইউনানী চিকিৎসা বিজ্ঞান মতে বায়ু, পানি, আগুন, মাটি দ্বারা মানবদেহ গঠি। (৩) আয়ুর্বেদ মতে, দেহে তিন প্রকার রস পদার্থ যথা-বায়ু, কফ ও পিত্ত রয়েছে আর ইউনানী চিকিৎসা বিজ্ঞান মতে, দেহে চার প্রকার রস পদার্থ রয়েছে এরা হল-রক্ত, শ্লেষ্মা, পিত্ত ও অম্ল। (৪) ঔষধ প্রস্তুতের ক্ষেত্রে এদের নিজস্ব স্বকীয়তা রয়েছে। (৫) ভেষজ শোধনের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম-কানুন রয়েছে। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের উৎস আর চর্চা ভারতীয় উপমহাদেশে। তর্ক, শুশ্রুত, ভরদ্বাজ ছিলেন এই শাস্ত্রের আদিগুরু রোগীর মুখের আর দেহের আকৃতি ভেদে রোগের লক্ষণ আর বিভিন্ন গাছগাছড়া, লতাপাতা সহযোগ ঔষধ প্রয়োগ আর প্রক্রিয়াজাতকরণ এ এই শাস্ত্রের ভূমিকা অনবদ্য। অপরপক্ষে ইউনানী চিকিৎসা পদ্ধতির আবিষ্কার ঘটে গ্রীসের হুনান বা ইউনান প্রদেশে। তিক্ত

গাছপালার রসের সাথে চিনি মিশিয়ে সিরাপ তৈরী আর বটিকাকে চিনির আবরণ দিয়ে সুগার কোট করা হয়েছে ইউনানী শাস্ত্রের পণ্ডিতদের হাত দিয়ে। এছাড়া অ্যালকোহল মুক্ত ফর্মুলায় ঔষধ তৈরীতে এই শাস্ত্র ভূমিকা রেখেছে। ইবনে সিনা ইউনানী শাস্ত্রের প্রধান বিজ্ঞানী। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের সাহায্য নিয়ে চিকিৎসকের নাম কবিরাজ। আর ইউনানী শাস্ত্রের সাহায্য নিয়ে চিকিৎসা সম্পাদনকারীদের হেকীম বলে।

৪০৩.২.৪ Medicine in colonial India-Oriental-occidental conflict-development of western medicine

ব্রিটিশ শাসকগণ ঔপনিবেশিক প্রজাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে চিন্তিত ছিলেন না। তা সত্ত্বেও ভারতে পাশ্চাত্য চিকিৎসার প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক পরিকাঠামো ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রই নির্মাণ করেছিল। উনিশ শতকের প্রথম পর্যায়ে রাষ্ট্রের পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিস্তারের মূল লক্ষ্য ছিল ইংরেজ সেনাবাহিনীর স্বাস্থ্য রক্ষা করা। রাধিকা রামাসুব্বানে মনে করেন যে উশি শতকে পাশ্চাত্য চিকিৎসা শ্বেতাঙ্গদের মধ্যেই সীমিত ছিল। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর অনেক সৈন্য যৌনরোগে আক্রান্ত হলে সরকার তাদের স্বাস্থ্যের জন্য চিন্তিত হয় কারণ ভারতে ব্রিটিশ শাসনের মূল স্তম্ভ ছিল সেনাবাহিনী। ইউরোপীয় সেনাদের পরিবার তাদের সাথে ভারতে না থাকায় অনেক ইউরোপীয় সেনাগণ পতিতা পল্লীতে যাতায়াত করত এবং তারা যৌনরোগে আক্রান্ত হত। তাই সাম্রাজ্যের সামরিক স্বার্থে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় পতিতা মহিলাদের চিকিৎসার সুবিধা দেওয়ার জন্য প্রথম অগ্রসর হয়েছিল। এই ফলশ্রুতি হিসেবে সামরিক ছাউনিতে বা cantonment areas-এ 'lock hospital' ব্যবস্থা শুরু করা হয় পতিতাদের যৌনরোগের চিকিৎসার উদ্দেশ্যে। লন্ডনে অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে এই নামে হাসপাতাল প্রচলিত ছিল। "In the nineteenth century it was accepted that veneral diseased patients would be loched up until they were cured and it was invariably understood that these patients would be women prostitutes. Women found to be disordered on customary days of inspection were to be sent at once to the hospital."[৪] সেনাবাহিনীর ছাউনির কাছাকাছি 'লালবাজার' বা 'যৌনপল্লী থাকত। লালবাজারের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে যে বয়োজ্যেষ্ঠা মহিলা থাকত, তার কর্তব্য ছিল পতিতাদের স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি দওয়া এবং যৌনরোগে আক্রান্ত পতিতাদের বহিষ্কৃত করা বা লক হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য প্রেরণ করা। সরকার বেরহামপুর, কানপুর, ফতেগড়, আগ্রা প্রভৃতি জায়গায় diseased public women-দের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নির্মাণ করে। সরকার ইউরোপীয় সেনাদের ভারতে পরিবার রক্ষার জন্য অধিক অর্থ খরচে অনিচ্ছুক ছিল। তাই ভারতীয় পতিতাদের সাথে ইউরোপীয় সৈন্যদের যৌন সম্পর্ককে তারা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। ১৮৬৮ সালের Indian Contagious Disease Act দ্বারা পতিতাদের নাম নথিভুক্ত করা, নিয়মিত ব্যবধানে পতিতাদের শারীরিক পরীক্ষা করা এবং বাধ্যতামূলক চিকিৎসা করানোর কথা বলা হয়েছিল। ফলে এই 'লক হাসপাতালে' ব্রিটিশের খাতায় নথিভুক্ত বেশ্যা মহিলারা প্রথম পশ্চিমি চিকিৎসার সুযোগ লাভ করেছিল।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার ছিল পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যা। "The Colonial establishment took it up as a part of its imperial credo, and the missionaries incorporated it into there evangelizing project while the critics of empire identified western medicine not with liberation and well being but with subjugation and slavery."[৫]

ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে পুরুষ শাসিত শাসনব্যবস্থায় ঔষধ ?এবং স্বাস্থ্য ছিল পুরুষকেন্দ্রিক এবং মহিলারা পুরুষের স্বাস্থ্যের সাথে সংযুক্ত বস্তু বা "appendages to the health of man" বলে পরিগণিত হত। একই সময়ে ইংল্যান্ডের মহিলারা ধাত্রীদের দ্বারা সন্তান প্রসবের সুবিধা লাভ করতেন এবং চিকিৎসাবৃত্তি ধাত্রীবিদ্যাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের পর্যায় উন্নীত করেছিল। ১৮৩৩ সাল থেকে প্রসূতি ও নারীর শরীর সংক্রান্ত "Books of Advice" প্রকাশিত হতে থাকে। নারীদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসার প্রগতি ঘটে যখন ১৮৪৭ সালে 'ক্লোরোফর্ম' আবিষ্কৃত হয় যা প্রসবের বেদনাকে অনেকাংশে লাঘব করে দিয়েছিল। উনিশ শতকের অগ্রগতির সাথে সাথে ভারতের প্রথাগত প্রসূতি প্রথা এবং মায়ের স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় ধারণা সমালোচিত হতে থাকে। সূতিকা গৃহে অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় সন্তান প্রসব হয় এবং মাকে অবজ্ঞার সাথে ফেলে রাখা হয়। আঁতুরঘরের অবস্থার জন্যই মাতা এবং শিশুর মৃত্যুর হার ভারতে অনেক বেশী পরিমাণে দেখা যায়। ধাইয়ের সাহায্যে শিসু প্রসব করানো ছিল প্রসূতির প্রথা। ধাই বৃত্তিতে যুক্ত রমণীরা ছিল নীচু জাতের হিন্দু বা গরীব মুসলমান মহিলাগণ। বাংলায় হাদি বা ডোম, উত্তর ভারতে চামার বা মেথরানি এবং দক্ষিণে নাপিত জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল ধাই মহিলারা এবং তাদের মধ্যে পেশাদারিত্বের অভাব লক্ষণীয়। স্বল্প অর্থের বিনিময়ে ধাই সন্তান প্রসব ও আঁতুরঘরে মা ও সন্তানকে দেখাশোনা করত। কিন্তু অশিক্ষা ও অজ্ঞতার ফলে মা ও সন্তানের স্বাস্থ্য বিপদগ্রস্ত হত। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্নতা তার কাছে অজানা ছিল।

ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী ঔপনিবেশিক প্রজাদের দ্বারা আগ্রহী ছিল না, অপরদিকে ব্রিটিশ বা ভারতীয় পুরুষগণ জন্ম প্রক্রিয়া সম্বন্ধে নিরুৎসহ ছিল। প্রথমে মিশনারী মহিলারাই এই প্রসূতি প্রথার দৃষ্টিপাত করেন। বালফোর এবং ইয়ং বলেছেন যে, "The stimulus for the first dhai training schemes was provided by those missionaries who had gained acess beyond the purdah as teachers and were grieved to see their young pupils dying in child birth."[৬] জেনানা মহল ছিল তাদের দৃষ্টিতে অজ্ঞতা, কুসংস্কার, আবর্জনা ও ব্যাধির কেন্দ্রস্থল। দেশীয় মহিলাদের ঔপনিবেশিক চিকিৎসার সাথে যুক্ত করার একটি উপায় ছিল প্রথাগত ধাই ব্যবস্থার সংস্কারসাধন।[৭] এই প্রসঙ্গে ১৮৯০ সালে মেরি ফ্রান্সিস বিলিংটন লিখেছিলেন যে, "The ijfant mortality is very high not on account of evil intent but is due to the apalling ignorance of the dhais whose method of treaatment are barbarous and would be enough to kill every unfortunate victim upon whom they parctised."[৮] Margaret Balfour এবং Ruth Young আরো বলেছেনযে পর্দানসীন রমণীগণ কখনই পুরুষ ডাক্তারদের দ্বারা চিকিৎসা করাতেন না বা সন্তান জন্মের বিষয়ে পুরুষ সাহায্য তাদের কাছে কাঙ্ক্ষিত ছিল না।[৯]

উনিশ শতকের শেষভাগ ব্রিটিশ শাসনাধীন বাংলার জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থায় হাল শোচনীয়। ব্রিটিশ আসার আগে পরিস্থিতি ছিল ভিন্নরূপ। কোনো ভারী শিল্প গড়ে ওঠার ব্যাপার না থাকায় সমাজে হঠাৎ করে কোনো স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা দেখা দিত না। স্বাভাবিকভাবে স্বাস্থ্য সমস্যা ছিল জনগণের ব্যক্তিগত ব্যাপার। এই সমস্যা সহজেই আয়ুর্বেদ, সিদ্ধা, ইউনানি, টোটকা চিকিৎসা প্রভৃতি ভারতীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা দ্বারা সমাধান করা যেত। যদিও কখনো কখনো মহামারি বা বিভিন্ন আঞ্চলিক রোগে অনেক লোক মারা যেত। কিন্তু এমন ঘটনা খুব কমই ঘটত, ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতির ওপর জনগণের পূর্ণ আস্থা ছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে বাংলায় শুরু হয় ব্যাপক শিল্পায়ন। শিল্পাঞ্চলগুলোকে কেন্দ্র করে জনবসতি বাড়তে থাকে। বহু রেললাইন, সড়ক, জলাধার ও বাঁধ নির্মাণ করা হয়। ফলে জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার ঘটে ভীষণ অবনতি। ইতিমধ্যে

সরকার কেবল মিলিটারিদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিয়ে কলেরার প্রকোপ কমাতে সমর্থ হলেও গ্রামাঞ্চলে ম্যালেরিয়া, কলেরা ও কালাজ্বরের প্রকোপ কমাতে সমর্থ হয়নি। জলবায়ু ও পরিবেশগত কারণে বাংলা হয়ে ওঠে কলেরা, ম্যালেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা, বসন্ত, প্লেগ প্রভৃতির মড়ক সৃষ্টিকারী রোগের লীলাক্ষেত্র।

১৩৬৬ বঙ্গাব্দের প্রথম সংখ্যা আয়ুর্বিজ্ঞান পত্রিকা জানায়, ১৮৭১-৮১ সালের মধ্যে বাংলায় লাখ লাখ লোক প্রাণত্যাগ করে। এর মধ্যে মেদিনীপুর এবং বর্ধমানে মৃতের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে পঁচাশি হাজার এবং দেড় লাখ। ১৮১৭-৩১ খ্রিষ্টাব্দে কলেরা মহামারিতে বহু ইউরোপীয় এবং ভারতীয় প্রজা (১/১০ ভাগ গোরা সৈন্য বেং ১৮ মিলিয়ন ভারতীয়) মারা যায়। ১৮৯০-১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে ম্যালেরিয়া মহামারির বিশ মিলিয়ন মানুষের মৃত্যু ঘটায়।

খ. চিকিৎসা-সংকট এবং জাতীয় জাগরণ এই দুঃসহ জনস্বাস্থ্য পরিবেশের পাশাপাশি ছিল চিকিৎসকের নিতান্তই অপ্রতুলতা। ১৮৭০ সালে প্রকাশিত ক্যাম্পবেল ব্রাউনের রিপোর্ট থেকে জানা যায়-তখন প্রতি দুহাজার জন পিছু একজনও মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ কার ডাক্তার ছিল না। অতএব উনিশ শতকের শেষভাগে বাংলার গ্রামীণ মানুষকে দেশীয় অশিক্ষিত হাতুড়ে চিকিৎসকের ওপরই নির্ভর করতে হতো। ১২৮৪ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যা সাধারণীতে প্রকাশিত একটি পত্রে বলা হয়, আনাড়ি চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করান আর ইচ্ছাপূর্বক মৃত্যু ঘটান এ দুই-ই সমান। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের লোকে এটা বোঝে না। আবার অনেকে বুঝিচাও কেহ অসংগতি প্রযুক্ত, কেহ বা আবশ্যকমত সুচিকিৎসক নাপাওয়ায় অগত্যা সাক্ষাৎ কৃতান্তস্বরূপ সেই পাপাত্মাদিগের হস্তে জীবন সর্বস্ব প্রাণাধিক পুত্রকন্যাগণকে সমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। যিনিই দুইটা রঙের বড়ি পাকাইয়া চাদরের খুটে বাঁধিয়া বাহির হইলেন, তিনিই কবিরাজ। যিনিই একখানা সাইন বোর্ড ঝুলাইয়া দুটো শিশি বোতল সাজাইয়া, জমকাইয়া বসিলেন, তিনিই ডাক্তার। পূর্বের যেমন কেহল লেখাপড়া না শিখিলে এবং জীবিকা নির্বাহের অন্য উপায় না থাকিলে, পাঠশালায় গুরুমহাশয় হইত, আজকাল যিনি ইংরেজির দু'পাতা উল্টাইয়া, স্কুল ছাড়িয়া, কাজকর্ম্মের সুবিধা করিয়া উঠিতে না পারিলেন, তিনিই ডাক্তার হইলেন। কবিরাজদিগের মধ্যে অনেকের বিদ্যাও আবার এদের অপেক্ষাও কিছু অধিক, মা সরস্বতীর সহিত তাঁহাদিগের চিরবিবাদ, কখন দেখা-সাক্ষাৎও নাই। তাঁহাদের কাহার পিতা পিতামহ, কাহার মাতা মাতামহ, কাহার শ্বশুর সম্বন্ধী, কাহার কোন কুলের কে চিকিৎসক ছিলেন, তাঁহারা সেই স্বত্বে স্বত্ববান হইয়া, সেই দোহাই দিয়া কবিরাজ হইয়া বসিয়াছেন। এইরূপ সব ডাক্তার কবিরাজ, বিশেষতঃ ডাক্তার আজকাল গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে মূর্তিমান হইয়া বিরাজ করিথে। বাংলাজুড়ে তখন চলছে নবজাগরণ বা রেনেসাঁসের প্রভাব। ইংরেজি ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর তমসা কাটিয়ে, কুসংস্কারের মোহনিদ্রা ভেঙে জেগে উঠছে জাতি। রেনেসাঁসের একটা বিশেষ লক্ষণ হচ্ছে, সর্ববিষয়ে কৌতূহল বা অনুসন্ধিৎসা। আর একটা মানবজীবনকে সর্বপ্রকারে ভরিয়ে নেওয়া ও বিকশিত করা। আমাদের রেনেসাঁস ইউরোপের রেনেসাঁসের মতোই মধ্যযুগের অন্ধকার থেকে আধুনিক যুগের আলোকে উত্তরণ, ইউরোপের চার শতাব্দীর বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত অনুবর্তন। আমাদের প্রেরণার উৎস প্রতীচ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান। ১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে সংবাদ ভাস্কর জানায়, মেডিকেল কলেজ চালু হওয়ার পর প্রথম দিকে বাংলার সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলো বিনা দ্বিধায় তাদের ছেলেদের এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভের জন্য পাঠাতে চাননি, তবে শিগগিরই পশ্চিমি চিকিৎসা বিজ্ঞানের চমৎকারিত্ব এবং কলেজ কর্তৃপক্ষের যত্নের দিকটি বিবেচনা করে তাঁদের মতের পরিবর্তন ঘটে। এগিয়ে এলেন কলকাতার বিত্তশালী মেডিকেল কলেজের পরীক্ষায় সফল ছাত্রদের পুরস্কৃত করে এবং যোগ্য

ছাত্রদের বিদেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ করে দিয়ে তাঁরা জাতীয় কর্তব্য পালন করলেন। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর একাই বত্রিশ বছর তিনজন ছাত্রের বিলেতে উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত ব্যয়ভার বহন করতেন। মেডিকেল কলেজের ছাত্রীদের জন্য রানি স্বর্ণময়ী দেবী কলকাতায় একটি আবাসিক কেন্দ্র নির্মাণের উদ্দেশ্যে এক লাখ টাকা দান করেছিলেন।

ক্রমে পশ্চিমি চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ভীষণ আগ্রহের সৃষ্টি হয়। কলকাতায় তখন একটিমাত্র মেডিকেল কলেজ এবং কয়েকটি মেডিকেল স্কুল। এদের পক্ষে তখনকার বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার মিলিত রাজ্যের আশি মিলিয়ন জনগণের চাহিদা পূরণ ছিল নিতান্তই অসম্ভব। চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষার এই আগ্রহ এতটাই ছিল যে, বহু যুবক মেডিকেল স্কুল ও কলেজে ভর্তি হতে না পেরে বিভিন্ন অবৈধ প্রতিষ্ঠান থেকে জাল সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে অবৈধভাবে চিকিৎসাব্যবসা শুরু করে দেয়।

গ. ভারতীয় ও বিদেশি চিকিৎসকদের মধ্যে বৈষম্য নেটিভ ডাক্তারদের প্রতি সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার বর্ণবিদ্বেষমূলক অবিচার ও নির্যাতন চালাতে অভ্যস্ত ছিল। কলকাতা, বম্বে ও মাদ্রাজের মেডিকেল কলেজগুলো থেকে বেশ কিছু ভারতীয় চিকিৎসক পাশ করে বেরোতেন। যদিও এঁরা অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানে ইন্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসের ইউরোপীয় চিকিৎসকদের সমান ছিলেন, কিন্তু এঁদের সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন পদে নিযুক্ত করা হতো। চাকরিতে উন্নতির সম্ভাবনা ছিল খুবই কম, মাসিক বেতনক্রম ছিল ১০০ থেকে ২০০ টাকা। একই জায়গায় একজন ইউরোপীয় আইএমএস ডাক্তার শুরুতেই মাসিক বেতন পেতেন ৪০০ টাকা। ইউরোপীয় এবং ইউরেশিয়ান অ্যাপোথেকারীরা, যারা একটিমাত্র মেডিকেল পরীক্ষায় পাশ করত-তারাও নেটিভ ডাক্তারদের থেকে বেশি বেতন পেত। ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও পাঞ্জাবের ভারতীয় সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জনরা তাঁদের অভিযোগ জানিয়ে সরকারের কাছে আবেদনপত্র পেশ করেন। কিন্তু সরকার এই আবেদনপত্র বাতিল করে। ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে পাটনার টেমপল স্কুল অব মেডিসিনের প্রিন্সিপাল ডা. সিম্পসন প্রায় একই রকমের একটি আবেদন সরকারের কাছে পাঠান। উত্তর বাংলার সার্জন জেনারেল মন্তব্য করেন :

১. অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জনরা যে কাজ করেন তার তুলনায় বেশি বেতন পান।

২. তাঁদের শিক্ষার খরচ প্রধানত সরকার বহন করে।

৩. বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাঁরা ব্যক্তিগত চিকিৎসাব্যবসা মাধ্যমে প্রচুর রোজগার করেন। কিন্তু ক্রমশ নেটিভ ডাক্তারদের মনে অতৃপ্তি বাড়তে থাকে এবং এর ফলে শুরু হয় উনিশ শতকের মেডিকেল রিফর্ম আন্দোলন।

১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৬ কলকাতার সিটি কলেজে জনসভা হয় সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায়। ডা. ভুবনমোহন সরকার সভাপতিত্ব করেন। এর পরবর্তী সভা হয় ৩০ মার্চ ১৮৯৬ কলকাতায় ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান হলে। এই সভায় রাজা পিয়ারীমোহন মুখার্জি, রাজা বিনয়কৃষ্ণ, মাননীয় শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, মাননীয় শ্রী এ. এম. বাসু, মি. ডবলু. সি. ব্যানার্জি, মি. মনোমোহন ঘোষ, মি. লালমোহন ঘোষ, রেভারেন্ড কালীচরণ ব্যানার্জি উপস্থিত ছিলেন। এই সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ড. কে. এন. বাহাদুরজি এবং ড. এ. আর পান্ডুরং সরকারের কাছে নিম্নলিখিত দাবি সনদ পেশ করেন :

১. সিভিল এবং মিলিটারি মেডিকেল সার্ভিস পৃথক করা হোক। একটি নূতন ভারতীয় মিলিটারি সার্ভিস তৈরি করা হোক।

২, সিভিল মেডিকেল সার্ভিসের পুনর্গঠন। এই সার্ভিসে ভারত ও ইউরোপের চিকিৎসকদের মধ্য থেকে নির্বাচন করতে হবে। প্রতিভা ও কর্মদক্ষতা দেখে অধিক সংখ্যায় ভারতীয় চিকিৎসকদের সিভিল মেডিকেল সার্ভিসে নিয়োগ করতে হবে। এই দাবি ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এবং অন্যান্য ফোরাম থেকেও করা হয়। কিন্তু সরকার মানতে রাজি হয়নি। অবশেষে দুটি মাত্র পরিবর্তন সরকার মেনে নেয়।

ক. কিছু সংখ্যক নির্বাচিত সিভিল অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জনের জন্য সিনিয়র গ্রেড (মাসিক বেতন ৩০০ টাকা) চালু হলো।

খ. প্রতি প্রদেশে অল্পকিছু নির্বাচিত সিভিল স্টেশনে ভারতীয় টিকিৎসকদের স্বাধীনভাবে দায়িত্ব দিয়ে নিয়োগ করা চালু হলো।

স্বাদেশিকতা ও দেশপ্রেম ড. প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর জাতীয় প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল কেমিক্যালে প্রস্তুত ওষুধ বাজারে চালু করার ব্যাপারে এক বিশেষ বাধার সম্মুখীন হন। তিনি জানান, স্থানীয় ওষুধ ব্যবসায়ীরা কেমিস্ট্রি (রসায়ন) বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। তাঁরা শুধুই লাভ-লোকসানের হিসাব বুঝতেন। বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রস্তুত ওষুধ দেখে তাঁরা প্রশংসা করলেও মাথা নেড়ে জানাতেন, 'নামী কোম্পানির বিলাতি ওষুধের বাজারে চাহিদা আছে। আমাদের খদ্দেররা দেশি ওষুধ ব্যবহার করতে চাইবেন না।' এ সত্ত্বেও অনেক চেষ্টার পর বেঙ্গল কেমিক্যালের দেশি ওষুধ স্থানীয় ওষুধের দোকানের শেলফের পেছনের দিকে ঠাঁই পেল। বিক্রির অবস্থা সহজেই বোধগম্য। এ অবস্থায় এগিয়ে এলেন ডাক্তার অমূল্যচরণ বসু বেং ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর। তাঁদের দেশপ্রেমের অনুপ্রেরণায় এগিয়ে এলেন ডাক্তার নীলরতন সরকার, ডা. সুরেশ সর্বাধিকারী প্রমুখ খ্যাতনামা চিকিৎসক। তাঁদের সবার একান্ত চেষ্টায় ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে বিক্রি বাড়ল বেঙ্গল কেমিক্যালের এইটকেনস টনিক সিরাপ, সিরাপ অব হাইপোফসফাইট প্রভৃতির। এছাড়া তাঁরা ছিলেনল দেশীয় ওষুধের ওপর যথেষ্ট আস্থাশীল। তাই কুর্চি, বসাক এবং কালমেঘের সিরাপ জোয়ানের আরক বাজারে চলতে থাকে।

চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : নির্মাণের কারিগর ১৮ অক্টোবর ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা রেনেসাঁসের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। এই দিন কলকাতা শহরের নয়জন খ্যাতনামা চিকিৎসক ১৬১ ওল্ড বৈঠকখানা বাজার রোড ঠিকানায় মিলিত হলেন। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল তৎকালীন অবস্থা পর্যালোচনা করে বিদেশি সরকারের শিক্ষা সংকোচন নীতি, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার আগ্রহ এবং আর্ত দেশবাসীর সামগ্রিক উপকারের জন্য একটি জাতীয় চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করা। এই প্রসঙ্গে জানাই স্যার চার্লস উডের নির্দেশনামা (উডস ডেসপ্যাচ) অনুযায়ী উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে বেসরকারি প্রচেষ্টায় সরাকরের শিক্ষা দফতরের পূর্ণ সহযোগিতা পাবার কথা। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন ডা. এম. এন. ব্যানার্জি। ডা. রাধাগোবিন্দ করের একান্ত আগ্রহে এই সভা আহূত হয়। সভায় উপস্থিত থাকেন-(১) ডা. অক্ষয়কুমার দত্ত, (২) ডা. বিপিনবিহারী মৈত্র, (৩) ডা. বিনোদবিহারী মিটার, (৪) ডা. কুমুদনাথ ভট্টাচার্য্য, (৫) ডা. বিবি ব্যানার্জি, (৬) ডা. জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী, (৭) ডা. এম. এল. দে, (৮) ডা. আর. জি. কর, (৯) ডা. এম. এন. ব্যানার্জি। এই সভায় সিদ্ধান্ত হয়, জাতীয় স্বার্থে একটি বেসরকারি চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে। এই উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত অস্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। ডা. এম. এন. ব্যানার্জি-চেয়ারম্যান ডা. কে. এন. ভট্টাচার্য-সেক্রেটারি ডা. আর. জি. কর (অডিটর), ডা. এ. কে. দত্ত (অডিটর) ডা. জে. সি. লাহিড়ী-কোষাধ্যক্ষ ডা. বি. বি. মৈত্র, ডা. এম. এল. দে, ডা. ব্রজেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, ডা. আর. কে. সেন, ডা. পি. সি. মজুমদার, ডা. এস. সি. বোস, ডা.

এস. বি. দে (সদস্য)। নভেম্বর ১৮৮৬, স্কুল শুরু হয়। এখানে আয়ুর্বেদ এবং অন্যান্য বিভাগ ছিল। এর না হয় ক্যালকাটা স্কুল অব মেডিসিন। ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে আগস্ট মাসে স্কুলের অ্যালোপাথি বিভাগ আলাদা করে নেওয়া হয়। এর নামকরণ হয় ক্যালকাটা মেডিকেল স্কুল।

স্কুল শুরু হয় ১৬১ ওল্ড বৈঠকখানা বাজার রোড ঠিকানায়। এরপর ঠিকানা বদল হয়ে প্রথমে হলো ১৫৫ ও পরে ১২৭ বৌবাজার স্ট্রিটে। ১৮৮৯ সালে স্কুল পরিচালনার জন্য একটি সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন করা হয় (১৮৮২ সালে অ্যাক্ট VI অনুযায়ী) প্রথম কার্যকরী সমিতি ছিল এইরকম : প্রেসিডেন্ট-ডা. লালমাধব মুখার্জি সেক্রেটারি-ডা. আর. জি. কর সদস্যগণ-(১) মি. আর. ডি. মেহতা, (২) বাবু ভুপেন্দ্রনাথ বসু, (৩) ডা. প্রফুল্লচন্দ্র রায়, (৪) ডা. আর. সেন, (৫) বাবু হরিপদ ঘোষাল, (৬) বাবু সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ। ক্যালকাটা মেডিকেল স্কুলে ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলের পাঠক্রম অনুযায়ী শিক্ষাদান করা হতো। শিক্ষাদানের মাধ্যম ছিল বাংলা। এর সঙ্গে একটি বহির্বিভাগীয় হাসপাতাল ছিল। ১৮৮৯ সালে এই হাসপাতালে প্রায় চার হাজার রোগীর চিকিৎসা করা হয়। স্কুলটির নিজস্ব বালো হাসাপাতাল না থাকায় স্কুল কর্তৃপক্ষ মেয়ো হাসপাতাল, চাঁদনী হাসপাতাল এবং সুকিয়া স্ট্রিট ডিসপেন্সারিতে ছাত্রদের ক্লিনিক্যাল ক্লাসের ব্যবস্থা করেন। প্রথম দিকে শব-ব্যবচ্ছেদের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ১৮৮৯-৯০ সালে সরকারের অনুমতি নিয়ে শব-ব্যবচ্ছেদ শুরু হয়। প্রথমে শিক্ষাবর্ষ ছিল তিন বছর, পরে ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে শিক্ষাবর্ষ চার বছর করা হয়। খ্যাতনামা চিকিৎসকগণ এই স্কুলে বিনা বেতনে শিক্ষাদান করতেন। শিক্ষকদের তালিকা ছিল নিম্নরূপ-মেডিসিন : ডা. জগবন্ধু বসু, এম. ডি, ডা. এ. এন. ব্যানার্জি, এমআরসিএস, ডা. আর. জি. কর, এলআরসিপি সার্জারি : ডা. জে. এন. মিত্র, এমআরসিপি চক্ষু বিভাগ : ডা. লালমাধব মুখার্জি, এলএমএস স্বাস্থ্য : ডা. সুন্দরীমোহন দাস, এমবি মেডিকেল জুরিসপ্রুডেন্স : ডা. যোগেন্দ্রনাথ দত্ত, ডা. এস. মুখার্জি, এমডিসিপিএসডি থেরাপিউটিকস : ডা. নীরদবিহারী বসু, এমবি ফার্মাকোলজি : ডা. বি. বসু অ্যানাটমি : অমূল্যচরণ বাসু, এমবি, ডা. শরৎচন্দ্র বসু, এমএএমবি ফিজিওলজি : ডা. এস. এন. দে, এমবিসিএস, বিএসসি, ডা. নীলরতন সরকার, এমএ, এমবি ডেমনস্ট্রেশন : ডা. মহেন্দ্রনাথ সেন, এমবি, ডা. শরৎচন্দ্র বসু, এমএ, এমবি, ডা. আশুতোষ নাথ ক্লিনিক্যাল মেডিসিনি : ডা. কে. সি. দত্ত, এমবি, ডা. এন. আর. সরকার, এমএএমবি, ডা. এস. বি. মুখার্জি, এমবি, ডা. এস. সি. সর্বাধিকারী, বিএ, এমবি শব-ব্যবচ্ছেদ : ডা. আর. জি. কর, ডা. অমূল্যচরণ বসু, ডা. শরৎচন্দ্র বসু শুরুতে মাত্র আটজন ছাত্র ছিল। ক্রমশ ছাত্রসংখ্যা বাড়ে।

সাল	ছাত্রসংখ্যা
১৮৯০-৯১	১১৮
১৮৯১-৯১	১৭০
১৮৯৪-৯৫	৩৭০
১৮৯৫-৯৭	৩৯৭
১৮৯৯-১৯০০	২৬০

মাতৃভাষায় মেডিকেল স্কুলগুলোর পঠনপাঠন এবং সংলগ্ন হাসপাতালগুলোর কার্যাবলি সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্য ১৮৯৩ সালে সরকার যে কমিটি গঠন করে, সেই কমিটিও এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে উচ্চ অভিমত

ব্যক্ত করে। ওই কমিটির রিপোর্টে বলা হয়-এই স্কুলটির শিক্ষক সংখ্যা বেশ ভালো। তাঁদের মধ্যে বিশজন ব্যক্তিগত পেশায় নিযুক্ত। শুধুমাত্র যাতায়াতের ভাড়া নিয়ে তাঁরা বিনা মাহিনায় এই স্কুলে পাঠদান করেন। ছাত্রদের মধ্যে কয়েকজন বিনা মাহিনায় পড়ে। স্কুলের শুভাকাঙ্ক্ষীদের পক্ষ থেকে বহু পদক ও পারিতোষিক দেওয়া হয়। ১৮৯৭ সালে স্কুল ২৯৮ আপার সার্কুলার রোডে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে একটি ছোট হাসপাতাল চালু করা হয়। শয্যাসংখ্যা ছিল চোদ্দো। পরবর্তী বছরে স্কুল কর্তৃপক্ষ বেলগাছিয়ায় পঁচিশ হাজার টাকার বিনিময়ে প্রায় বারো বিঘা জমি ক্রয় করে।

এই জমিতে সত্তর হাজার টাকা ব্যয়ে একটি একতলা বাড়ি তৈরি করা হয়। এই সত্তর হাজার টাকার মধ্যে আঠারো হাজার টাকা পাওয়া যায় প্রিন্স অ্যালবার্ট ভিক্টরের কলকাতা ভ্রমণ উপলক্ষে সংগৃহীত তহবিল থেকে। ডা. লালমাধব মুখার্জি, স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, মি. আর. ডি. মেহতা প্রমুখের চেষ্টায় এই টাকা পাওয়া যায়। ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯ স্যার জন উডবার্ন এই হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ১৯০২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনিই এই হাসপাতালের উদ্বোধন করেন। হাসপাতালের নাম দেওয়া হয় আলবার্ট ভিক্টর হাসপাতাল। শয্যাসংখ্যা ছিল ছত্রিশ। ১৯০৩ সালের আগষ্ট মাসে ক্যালকাটা মেডিকেল স্কুল বেলগাছিয়ায় স্থানান্তরিত হয়। পরবর্তী বছর বাবু মানিকলাল শীলের দানে বারো হাজার টাকা ব্যয়ে তৈরি হয় পান্নালাল শীল আউটডোর ডিস্পেনসারি। ক্রমশ রোগীর চাপ বাড়তে থাকায় অ্যালবার্ট ভিক্টর হাসপাতালের দ্বিতীয়তলা তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলো। ডা. এম. এন. ব্যানার্জির অনুরোধে এগিয়ে এলেন পোস্তার রানি কস্তরীমঞ্জরী দাসী (কুমার রাধাপ্রসাদ রায়ের বিধবা স্ত্রী)। মোট খরচ (প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা) তিনি দান করলেন। এই টাকায় অ্যালবার্ট ভিক্টর হাসপাতালের দ্বিতল সম্পূর্ণ হলো। শয্যাসংখ্যা এবার দাঁড়াল একশ। ১৯০৯ সালের নভেম্বর মাসে স্যার এডওয়ার্ড বেকার নূতন ওয়ার্ডের উদ্বোধন করেন। ইতিমধ্যে ১৯০৪ সালে একটি বিশেষ ঘটনা ঘটল। কলেজ অফ ফিজিশিয়ানস অ্যান্ড সার্জনস অফ বেঙ্গল ছিল অপর একটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৮৯৫ সালের ১০ জুলাই মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ জন মার্টিন কোটসের মৃত্যু হয়। তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে কোটস মেমোরিয়াল ফান্ড খোলা হয়। ওই ফান্ড থেকে পাওয়া অর্থে কোটসের স্মৃতিতে একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়। এইভাবে সৃষ্টি হয় কলেজ অফ ফিজিশিয়ানস অ্যানআড সার্জনস অফ বেঙ্গল। ১৮৯৫ সালের প্রতিষ্ঠাবর্ষ থেকেই এই প্রতিষ্ঠানে কলেজ-মানের শিক্ষা দেওয়া হতো। ঠিকানা ছিল ২৯৪ আপার সার্কুলার রোড। ১৯০৪ সালে এই কলেজে মাত্র বারোজন ছাত্র ছিল। ১৯০৪ সালে এই প্রতিষ্ঠান ক্যালকাটা মেডিকেল স্কুলের সঙ্গে সংযুক্ত হলো। সম্মিলিত প্রতিষ্ঠানটির নাম হলো দি ক্যালকাটা মেডিকেল স্কুল অ্যান্ড দি কলেজ অফ ফিজিশিয়ানস অ্যান্ড সার্জনস অফ বেঙ্গল। এই সম্মিলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে দুটি শাখা ছিল। স্কুল বিভাগে মাতৃভাষায় চার বছরের শিক্ষাক্রম চালু ছিল। কলেজ বিভাগে চালু ছিল ইংরেজিতে পাঁচ বছরের শিক্ষাক্রম। এরপর ঘটনাক্রমে এলো নাটকীয় পটপরিবর্তন। ১৯১১ সালে মেডিকেল রেজিস্ট্রেশন বিল চালু হতে চলেছে। এই অবস্থায় সরকার সকল বেসরকারি চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছে আবেদন জানাল সকলে মিলিত হয়ে একটি উচ্চমানের বেসরকারি মেডিকেল কলেজ গড়ার। সরকারের মূল উদ্দেশ্য ছিল, এই সম্মিলিত প্রতিষ্ঠানটিকে আর্থিক অনুদান দিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলার মেডিকেল কাউন্সিলের অনুমোদন পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করা। এই ব্যাপারে বিশেষভাবে উৎসাহী ছিলেন স্যার পার্ডে লিউকিস এবং সার্জন জেনারেল হ্যারিস। দু'বছর ধরে এই প্রচেষ্টা চলল। কিন্তু বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বিভিন্নরকম স্বার্থের

সংঘাত এবং তাদের প্রতিনিধিদের ব্যক্তিগত আপোসহীন মনোভাবের জন্য এ প্রচেষ্টা সফল হলো না। এবার ক্যালকাটা মেডিকেল স্কুল অ্যান্ড দি কলেজ অব ফিজিশিয়ানস অ্যান্ড সার্জনস অব বেঙ্গল সরকারের কাছে প্রস্তাব রাখল বেলগাছিয়ার এই প্রতিষ্ঠানটিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত মেডিকেল কলেজরূপে গড়ে তোলার জন্য সরকারি অনুদানের। এ ব্যাপারে ১৯১২-১৩ সালে ডা. এম. এন. ব্যানার্জি, ডা. নীলরতন সরকার, ডা. সুরেশ সর্বাধিকারী, ভূপেন্দ্রনাথ বসু এবং অন্যরা বেশ কয়েকবার লর্ড কারমাইকেল (গভর্নর অব বেঙ্গল) এবং স্যার উইলিয়াম ডিউকের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলোচনা করেন। অবশেষে ১৯১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে সেক্রেটারি অব স্টেট একটি কর্ম পরিকল্পনা অনুমোদন করেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অথবা সরকারি মেডিকেল স্কুল অনুমোদিত বেসরকারি (স্বাধীনভাবে চিকিৎসকদের দ্বারা পরিচালিত) মেডিকেল স্কুল ও কলেজ স্থাপন করার ব্যাপারে পৃষ্ঠপোষকতা করা হবে। সরকার শর্তসাপেক্ষে এককালীন মুখ্য অনুদান হিসেবে পাঁচ লাখ টাকা এবং নিয়মিতভাবে পঞ্চাশ হাজার টাকার বার্ষিক অনুদান দিতে প্রতিশ্রুত হয়। এই অনুদানের শর্ত ছিল নিম্নরূপ :

১. নির্মীয়মান বাড়িগুলোর নকশা সার্জন জেনারেলের দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে।

২. সকল প্রকার নির্মাণকার্য সরকারের পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের তত্ত্বাবধানে হবে।

৩. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো সরকারের পক্ষে একটি ডিড সম্পাদন করতে হবে।

৪. কলেজ কর্তৃপক্ষের ওপর ভার থাকে।

৫. জনগণের কাছ থেকে দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা সংগ্রহ করা।

৬. বিশ্ববিদ্যালয় এবং পৌরসভার কাছ থেকে নিয়মিতভাবে বার্ষিক চল্লিশ হাজার টাকার অনুদান সংগ্রহ করা।

কলেজ কর্তৃপক্ষ এই শর্ত মেনে নেন। এরপর শুরু হয় অর্থ সংগ্রহের প্রচেষ্টা। লোকহিতৈষীবদান্য ব্যক্তিরা এগিয়ে এলেন। স্যার রাসবিহারী ঘোষ পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করলেন। সমপরিমাণ অনুদান পাওয়া গেল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে রক্ষিত প্রয়াত স্যার তারকনাথ পালিত ফান্ড থেকে। মি. পি. এন. টেগোর দিলেন পঁচিশ হাজার টাকা, বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর দিলেন দশ হাজার টাকা, কুমার বিষ্ণুপ্রসাদ রায় দিলেন ছয় হাজার টাকা। স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি, মি. ভূপেন্দ্রনাথ বসু এবং স্যার এস. পি. সিনহা প্রত্যেকে দিলেন পাঁচ হাজার টাকা। মি. ভূপেন্দ্রনাথ বসু সরকারের চাহিদা অনুযায়ী কয়েক লাখ টাকার আর্থিক দায়ভারের জামিনদার হলেন। এইভাবে জনগণের বদান্যতায় সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী মুখ্য অর্থনৈতিক দায়ভারের সংস্থান হলো। মি. ভূপেন্দ্রনাথ বসুর অনুরোধে বাংলার মাননীয় গভর্নর লর্ড কারমাইকেল কলকাতা কর্পোরেশনের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্যের ব্যাপারে সহযোগিতা করেন। অবশেষে কর্পোরেশনের মাননীয় চেয়ারম্যানের সহায়তায় কলকাতা কর্পোরেশন বছরে ত্রিশ হাজার টাকা অনুদান দিতে রাজি হলো। কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বার্ষিক দশ হাজার টাকা অনুদান দিতে অসমর্থ হলো। স্কুল কর্তৃপক্ষ সরকারকে জানান যে, তারা এই টাকা তাদের প্রাপ্য ফি থেকে সংগ্রহ করবে। অবশেষে সরকার এই শর্ত মকুব করল। ১৯১৬ সালের জানুয়ারি মাসে প্রিলিমিনারি সায়েন্টিফিক এমবি পরীক্ষা পর্যন্ত অনুমোদন পাওয়া গেল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে। ৫ জুলাই ১৯১৬ বাংলায় মাননীয় গর্ভনর লর্ড কারমাইকেল ভারতের প্রথম

সরকার-অনুমোদিত বেসরকারি মেডিকেল কলেজের উদ্বোধন করেন। কলেজটির নাম দেওয়া হলো বেলগাছিয়া মেডিকেল কলেজ। প্রতিষ্ঠানটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্স্ট এমবি এবং ফাইনাল এমবি মানের অনুমোদন পেল যথাক্রমে ১৯১৭ এবং ১৯১৯ সালে। এভাবেই ভারতের চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে সম্পূর্ণভাবে দেশীয় চিকিৎসকদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব ঘটল। ১৯১৯ সালের ১৭ এপ্রিল মেডিকেল এডুকেশন সোসাইটি অফ বেঙ্গলের (কলেজের পরিচালন সংস্থা) বার্ষিক সাধারণ সভায় ডা. নীলরতন সরকারের প্রস্তাব অনুসারে কলেজের নামকরণ হয় কারমাইকেল (মেডিকেল কলেজ)। ২ মার্চ ১৯৪৮ মেডিকেল সোসাইটি অফ বেঙ্গলের বিশেষ সাধারণ সভায় আবার কলেজ ও হাসপাতালের নাম পরিবর্তিত হয়। এবার নামকরণ হয় আর. জি. কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল।

জাতীয় চিকিৎসাবিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এই জাতীয় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের সৃষ্টি ডাক্তার রাধাগোবিন্দ করের এক অনন্য কীর্তি। ১৬ ডিসেম্বর ১৮৮৮ সালে ডাক্তার আর. জি. কর এই প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারির পদ গ্রহণ করেন। এরপর একটানা ত্রিশ বছর এই স্কুলের এবং পরবর্তীকালে কলেজের সেক্রেটারি পদে তিনিই কাজ করেন। এরপর একটানা ত্রিশ বছর এই স্কুলের এবং পরবর্তীকালে কলেজের সেক্রেটারি পদে তিনিই কাজ করেন মৃত্যুদিন পর্যন্ত (১৯১৮)। দেশের স্বার্থে এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। কিন্তু এই কাজে একদিনের জন্যও তিনি আত্মপ্রচারের চেষ্টা করেননি। তিনি ছিলেন নীরব কর্মী। সকলের পশ্চাতে তেকে তিনি নিজ কর্তব্য পালন করতেন। প্রথমে এই কাজে তিনি দেশের লোকের কাছ থেকে বিশেষ উৎসাহ পাননি। প্রায় সকলেই তাঁকে এই কাজে অগ্রসর হতে নিষেধ করেছিল। এমনকী স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁকে বলেছিলেন-সাধারণ স্কুল আর মেডিকেল স্কুল স্থাপন করার মধ্যে অনেক প্রভেদ। কয়েকটি বেঞ্চ ও চেয়ার নিয়ে একটি সাধারণ স্কুল স্থাপন করা যায়। কিন্তু মেডিকেল স্কুল স্থাপন করতে হলে বিস্তর অর্থ, সরঞ্জাম এবং অভিজ্ঞ শিক্ষক যোগাড় না হলে মেডিকেল মেডিকেল স্কুল একটি ভুয়া জিনিস হবে মাত্র। তার দ্বারা দেশের কাজ হবে না। কিন্তু ডা. কর নিরুৎসাহ হননি। ধৈর্য, অধ্যবসায় এবং একান্ত নিষ্ঠায় তিনি তাঁর প্রয়াস চালু রেখেছেন। এবং অবশেষে সাফল্যের মুখ দেখতে পেয়েছেন। পেয়েছেন সর্বসাধারণের কাছ থেকে উৎসাহ, সহানুভূতি এবং অর্থনুকুল্য। ডা. রাধাগোবিন্দ করের এই প্রয়াসে এগিয়ে এসেছেন ডা. লালমাধব মুখোপাধ্যায়, ডা. অমূল্যচরণ বসু, ডা. সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী, স্যার ডা. নীলরতন সরকার, ডা. প্রাণধন বসু, ডা. এম. এন. ব্যানার্জি, ডা. সুরথচন্দ্র বসু, ডা. ভালানাথ বসু, ডা. সুন্দরীমোহন দাস, ডা. মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়, ডা. কুমুদনাথ গাঙ্গুলী, ডা. এম. এল. দে প্রমুখ খ্যাতনামা চিকিৎসক। এঁরা নানাভাবে ডা. করকে সাহায্য করেন এবং তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষকতা করেন। মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ছিলেন ডা. করের আত্মীয় এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু। তিনি প্রথম থেকেই ডা. করের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর অনুরোধে বাংলার গভর্নর লর্ড কারমাইকেল কর্পোরেশনের কাছ থেকে এবং সরকারি ভাণ্ডার থেকে এই প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করেন। এছাড়া কলেজের সরকারি অনুমোদনের সময় ভূপেন্দ্রনাথ কয়েক লাখ টাকার আর্থিক দায়ভারের জামিনদার হন। বাংলার মাননীয় গভর্নর লর্ড কারমাইকেল, ডিরেক্টর জেনারেল অফ ইন্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিস স্যার পার্ডে লিউকিস, ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ সিভিল হসপিটাল, বেঙ্গল কর্নেল এডওয়ার্ডস এবং এডুকেশন মেম্বার, ভাইসরয়ের কাউন্সিল স্যার শঙ্করণ নায়ার এই প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতির ব্যাপারে বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করেন। সমগ্র জাতি এঁদের কাছে ঋণী।

পর্যায়-৩

একক-৬-৭

বিন্যাসক্রম

৪০৩.৪.৬ সূচনা

৪০৩.৪.৭ 1

৪০৩.৪.৮ ১

৪০৩.৪.৬ সূচনা

এই পর্যায়ে ছাত্র ছাত্রীরা ঔপনিবেশিক ভারতে বিভিন্ন রোগ ব্যাধি, তার চিকিৎসা ও মানুষের মনোভাব সম্পর্কে জানতে পারবে।

ম্যালেরিয়া, কলেরা ও টিবি সংক্রান্ত আলোচনা

ম্যালেরিয়া (ইংরেজি Malaria) হল মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীদের একটি মশা-বাহিত সংক্রামক রোগ যার মূলে রয়েছে প্লাজমোডিয়াম গোত্রের প্রোটিস্টা (এক ধরনের অণুজীব)। ম্যালেরিয়া শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন টর্টি (Torti) ১৭৫১ সালে। ইতালিয় শব্দ Mal (অর্থ-দূষিত) ও ঞ্জুত্থ (অর্থ-বায়ু) হতে Malaria (ম্যালেরিয়া) শব্দটি এসেছে। তখন মানুষ মনে করতো দূষিত বায়ু সেবনে এ রোগ হয়। এটি একটি সংক্রমিত স্ত্রী মশার (আনোফেলিস মশা) কামড় সাথে শুরু হয়, যা তার লালা মাধ্যমে প্রোটিস্টর সংবহন তন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করে এবং শেষে যকৃতেতে পৌঁছায়, যেখানে তারা পরিপক্ক হয় এবং বংশবৃদ্ধি করে। ম্যালেরিয়ার সাধারণ রোগের লক্ষণসমূহ হল জ্বর এবং মাথাব্যাথা, যা খুব গুরুতর ক্ষেত্রে কোমা বা মৃত্যুর কারণ হতে পারে। রোগটি ক্রান্তীয় অঞ্চল, উপ-গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এবং অনেক সাহারা-নিম্ন আফ্রিকা, এশিয়া এবং আমেরিকা অঞ্চলসহ বিষুবরেখা ঘিরে ব্যাপক বিস্তৃত।

ঔপনিবেশিক ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে ম্যালেরিয়া একটি বহু আলোচিত ব্যাধি। তার কারণ প্রসঙ্গে মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই পরিবেশের কথা খুব গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। গোটা বঙ্গদেশে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পরে কলেরা ও ম্যালেরিয়া অসুখ দুটি মহামারীর রূপ নিয়েছিল যা বাংলা সম্পর্কে ঔপনিবেশিক মহলে একটা নেতিবাচক ধারণা গড়ে তুলেছিল। ১৮৩০-এর দশকে F P Strong অসুখের সেই সময়ে প্রচলিত ব্যাখ্যা অর্থাৎ পচা জিনিস থেকে নির্গত বায়ু দায়ী (miasma) বলে ধরা হত। সে সময়ে এটি ম্যালেরিয়া রোগের ক্ষেত্রেও গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছিলেন অনেক চিন্তকই। ১৮৪০ সালে James Taylor-এর লেখা থেকেও পাওয়া যায় যে তখন ম্যালেরিয়ার পরিবেশগত কারণের উপর খুব জোর দেওয়া হয়েছিল। সেই বছরেই সেপ্টেম্বরে বাৎসরিক বন্যা যেই কমে যায় তখন ম্যালেরিয়া

দেখা দেয় এবং নভেম্বরের শেষ পর্যন্ত তার তীব্রতা বজায় থাকে। কিছু কিছু এলাকা খুব বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সেখানে জনসাধারণ বহুদিন ধরে জ্বরে ভোগে।

Twining এর মতে, উত্তর ভারতের জনসাধারণ যথেষ্ট শক্তিশালী ও পরিশ্রমী জাতি এবং সেই তুলনায় বাঙালিরা দুর্বল যার কারণ অংশত তাদের প্রধান খাদ্য চাল, এছাড়াও অস্বাস্থ্যকর স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়া। ১৮৫০-এর দশকের মধ্যভাগ থেকে বাংলাদেশে দেখা দিল "বর্ধমান জ্বর" যা সম্ভবত ম্যালেরিয়া মহামারী, যার প্রকোপে বহু জেলার অনেক জনসাধারণ মারা যায়। ম্যালেরিয়া অসুখের প্রকোপের একটি সমাজতাত্ত্বিক গুরুত্বের কথা তাই ঐতিহাসিকরা উল্লেখ করেছেন।

বাংলার প্রাদেশিক স্যানিটারি কমিশনারদের রিপোর্টে ১৮৭১-১৮৭২ থেকে প্রত্যেক দশকের আদমশুমারিতে ম্যালেরিয়ার ধ্বংসাত্মক প্রভাবের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হত। ম্যালেরিয়া যে শুধু মৃত্যু ডেকে এনেছিল তাই নয়, এটি ছিল অন্য অনেক অর্থে ক্ষতিকারক। এই অসুখে ভুগে রোগী হয়ে পড়ত খুব দুর্বল, কর্মক্ষমতা হ্রাস পেত এবং এর দ্বারা ঔপনিবেশিক আদর্শ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের পুরুষ ও যুদ্ধবাজ জাতি এবং নারীসুলভ কমনীয় বাঙালি জাতির মধ্যে যে বিভাজন-মিথ আগেই করা হয়েছিল তা আরও সমর্থন অর্জন করেছিল। এই তত্ত্বের বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যেত ঔপনিবেশিক ভাবনায় চিকিৎসাবিজ্ঞান কিভাবে জাতিতত্ত্বকে প্রভাবিত করেছিল এবং বাঙালিরা নিজেদের শারীরিক ও রাজনৈতিক দুর্বলতার ব্যাখ্যায় এই ধরনের বিশ্লেষণের শরণাপন্ন হত। ১৮৮৯-এ বাংলার স্যানিটারি কমিশনারের হিসেব অনুযায়ী বাংলাদেশের সমগ্র মৃত্যুর তিন-চতুর্থাংশের কারণ ছিল ম্যালেরিয়া জ্বর যা বছরে প্রায় ১০ লক্ষ লোকের মৃত্যুর জন্য দায়ী ছিল।

ম্যালেরিয়া রোগের ইতিহাসের অন্য একটি দিক ছিল ম্যালেরিয়ার কারণ নির্ণয় ও নিয়ন্ত্রণের উপায়ের সন্ধানের জন্য গবেষণা। এই গবেষণালব্ধ ফলাফলকে কাজে লাগানোর প্রচেষ্টা ১৮৫০-এর দশকে T E Dempster বলে একজন অফিসার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ম্যালেরিয়া সম্পর্কে বোঝেন যে, এই রোগটা আসে খালের মাধ্যমে যে জলসেচ ব্যবস্থা আছে, তার সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে। 'spleen index' অর্থাৎ প্লীহার অবস্থাকে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বোঝার নির্ভরযোগ্য সূচক বলে তিনিই কিন্তু প্রথম দেখিয়েছিলেন। ম্যালেরিয়া মহামারীর কারণ অনুসন্ধানের জন্য সরকারের তরফ থেকে ১৮৬৩ সালে বাংলাদেশে একটি তদন্ত কমিটি স্থাপন করা হয়েছিল। এর ভারতীয় সদস্য রাজা দিগম্বর মিত্র রেলপথ নির্মাণ এবং রাস্তাঘাট ও বাঁধ নির্মাণ-এগুলির সাথে সাথেই ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব বা এর মধ্যে যোগাযোগ আছে বলে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

স্যার রোনাল্ড রসকর্তৃক ম্যালেরিয়া বাহক মশার বিষয়ে আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত ম্যালেরিয়া দমনের দুটি পন্থা ছিল-জলাভূমি প্রভৃতির ক্ষেত্রে উন্নতি গ্রহণ এবং প্রতিষেধক ওষুধ যেমন সিঙ্কোনা গাছের ছাল থেকে প্রস্তুত কুইনাইন প্রয়োগ। ১৯০০ সাল নাগাদ ভারতের বড় বড় শহরে নিকাশি ব্যবস্থার প্রচলন হয়েছিল। কুইনাইন পাউডার সরকারি চিকিৎসা বিভাগে বন্টন করা হত ও সেখান থেকে অন্যান্যদের কাছে পৌঁছত। এটা খুব ইন্টারেস্টিং যে কুইনাইনকে সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র (tool of Empire) মনে করা হত সেই সময়ে। অবশ্য এটি সবসময় খুব সফল অস্ত্র ছিল না এবং ওষুধ হিসেবে এর পার্শ-প্রতিক্রিয়া ছিল। আমাদের বর্তমানে কলকাতার পিজি হাসপাতালেই স্যার রোনাল্ড রস তাঁর পুরো গবেষণাটি চালিয়েছিলেন। রোনাল্ড রস অ্যানোফিলিস (anopheles) মশাকে ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু বাহক বলে চিহ্নিত করার পরে জনস্বাস্থ্য

নীতির ক্ষেত্রে একেবারে নতুন প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। রোনাল্ড রস ও তার অনুগামীরা ম্যালেরিয়ার মশা নিয়ন্ত্রণের জন্য 'mosquito brigade' গঠন ও 'নিকাশি ব্যবস্থা'র উন্নতি, জলাভূমি সাফাই ইত্যাদির ওপর জোর দিয়েছিলেন। অনেক ব্রিটিশ মেডিক্যাল অফিসার কুইনাইন প্রয়োগের ওপর বেশি জোর দিয়েছিলেন। ১৯১১ সালে ভারত সরকারের স্যানিটারি কমিশনার নিযুক্ত হলেন C P Lukisd-তিনি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পাশাপাশি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি বিধানের উপরেই জোর দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন রোনাল্ড রসের ভক্ত ও তাঁর অনুসারী।

১৯০৯ সালের অক্টোবরে সিমলাতে ইম্পেরিয়াল ম্যালেরিয়া কনফারেন্স হয়। এরপরেই স্থাপিত হল সেন্ট্রাল ম্যালেরিয়া কমিটি। এছাড়া Pasudism নামে একটা নতুন জার্নাল ছাপানো শুরু হয়েছিল। কনফারেন্সের পরে ম্যালেরিয়া সম্পর্কে সুদুরপ্রসারী কোনও গবেষণাকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষামূলক ব্যবস্থার সঙ্গে মেডিকেল অফিসারদের পরিচিতি করানোর জন্য পদক্ষেপ গ্রহণের সুবিধা হয়েছিল।

১৯১২ সালে প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান রিসার্চ ফান্ড এসোসিয়েশন-এর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাকর্ম ছিল ম্যালেরিয়াকে ঘিরে। এই সময়ে ঔপনিবেশিক সরকারের উন্নতির বাধাস্বরূপ ছিল ম্যালেরিয়া ব্যাধি। ঐ IRFA-এর তরফ থেকে ম্যালেরিয়া নিবারণ তদারকের জন্য প্রথম বছরে ৩৫ হাজার ৫০০ টাকা স্থানীয় সরকারগুলিকে প্রদান করা হয়েছিল। বাংলাদেশে C A Bentley সাহেব তখন স্যানিটারি অধিকর্তা ও জনস্বাস্থ্য অধিকর্তা। তাঁর মতে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব-এর জন্য দায়ী ছিল নদী ব্যবস্থার অবনতি ও সেচ ব্যবস্থার প্রতিকূলতা। রেলপথ নির্মাণের জন্য যেখানে সেখানে বাঁধ দেওয়ার ফলে জলনিকাশি ব্যবস্থা মার খাচ্ছিল, ফলে জমা জলে ম্যালেরিয়ার জীবাণু বৃদ্ধি পাচ্ছিল।ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল কৃষির, প্রচুর স্বাস্থ্যের অবনতি হত সাধারণ মানুষের। এবং, গ্রামগুলির জনসাধারণ প্রায়ই ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হত। তাঁর মতে অবস্থার উন্নতির জন্য প্রয়োজন ইতালির অনুসরণে পরিকল্পনা গ্রহণ অর্থাৎ মাটির উপরিভাগের জমা জল নিষ্কাশন এর সুবন্দোবস্ত করা, মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করা স্থানীয় আবহাওয়ার উপযোগী চাষ ও কৃষকদের সমৃদ্ধি বৃদ্ধির মাধ্যমে একই সঙ্গে কৃষিব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি।

অনেকের মতে, ঔপনিবেশিক আমলের ম্যালেরিয়া ছিল মানুষের তৈরি করা ম্যালেরিয়া। অর্থাৎ, রাস্তাঘাট ও রেলপথ নির্মাণ এবং নদীপথে বাঁধ নির্মাণ প্রভৃতি তথাকথিত উন্নতিমূলক কার্যকলাপের ফলে প্রথাগত জল নিকাশি ব্যবস্থার শেষ অবস্থা ও কৃষি ব্যবস্থার যে ক্ষতি হয় যার সঙ্গে পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের অবনতি তথা ম্যালেরিয়া প্রকোপ বৃদ্ধি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অতএব এখনকার সমস্যার সঙ্গে তখনকার সমস্যাতে একটা ব্যাপার তো প্রায় একই। সেটি হল আধুনিক সভ্যতা যত এগোবে বা প্রকৃতি নিধন যত হবে ততই কিন্তু বীজাণু রোগের প্রাবল্য বাড়বে এবং একইসঙ্গে প্রতিষেধক ওষুধও চালু হবে-ক্যাপিটালিজম সবটাকে অন্তর্ভুক্ত করে নেবে তার আলেখ্যে আর মাঝখানে বেশ কিছু মানুষ মহামারীতে মারা যাবে। যে কোনও সমাজ ব্যবস্থাতেই।

ম্যালেরিয়ার কারণটি যে 'ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট' নামের পরজীবী তা ১৮৮০ সালে ফরাসি বৈজ্ঞানিক আলফোনস ল্যাভেরান-এর আবিষ্কার থেকেই জানা গিয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় ইউরোপ-আফ্রি কা-এশিয়া-আমেরাকা সব মহাদেশেই সৈনাবাহিনীর মূল ঘাটক প্রতিপক্ষ নয় বরং ম্যালেরিয়া। ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শামিল তখন সারা বিশ্ব। ফ্রেঞ্চ আর্মির ডা আলফনসে লাভেরান এ সংগ্রামে প্রথম সফল ব্যক্তি। তিনি ১৮৭৮ সালে আলজেরিয়ার মিলিটারি হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন। তাঁর জন্য যুদ্ধটা শুধু একটা রোগের বিরুদ্ধে নয়। বিজ্ঞানের ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে নব নব আবিষ্কারকে ভ্রান্ত ধারণা, কুসংস্কার, বৈজ্ঞানিক

ভিন্নমতের সাথে সংগ্রাম করতে হয়েছে। ল্যাভেরনকেও লড়তে হয়েছে ম্যালেরিয়া দূষিত বাতাস, জলা-জংলা পরিবেশের কারণে ছয় হাজার বছরের এই জনপ্রিয় মতবাদের বিরুদ্ধে। আবারগ স্বদেশী লুই পাস্তুরের প্রভাবশালী 'জার্ম থিওরি''র সঙ্গেও দ্বিমত করার স্পর্ণা দেখাতে হয়েছে।

"জার্ম থিওরি" অনুযায়ী প্রত্যেক সংক্রামক রোগের জন্য ব্যাক্টেরিয়া দায়ী। একদল বিজ্ঞানী ব্যাসিলাস ম্যালেরিয়ায়ি নামক কল্পিত ব্যাক্টেরিয়াও আবিষকার করে ফেলেছিল। শত শত ম্যালেরিয়া রোগী পর্যবেক্ষণ করে লাভেরান একটা জিনিসদই পান, তা হল-ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত ব্যকিঞ্চতর রক্তে কালো রংয়ের একধরনের কণিকা। দু'বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর তিনি এই কালো কণিকাই যে একসানের পরজীবী, তা আপিস্কার করেন (তখনও অণুবীক্ষণ যন্ত্রে রক্তকণিকা পরীক্ষা করার স্টেইন আবিস্কৃত হয়নি)। সমসাময়িক বিজ্ঞানীদের অনেক সন্দেহ, বিতর্কের মধ্যেও তিনি কাজ করে যান। ম্যালেরিয়া শব্দের 'দুষিত জলাভূমি'তে (Malaria) শব্দটি এসেছে দ্বখন (দুষিত) aria (বায়ু) হতে, যে বায়ুর সাথে দুষিত জলাভূমিও যুক্ত। এই পরজীবীর অনুপস্থিতি প্রমাণ করার পর ম্যালেরিয়া পরজীবীর অস্তিত্ব কঠিন বিরোধীতার মুখে পড়ে।

অবশেষে ১৮৯৯ সালে অনুবীক্ষণ যন্ত্রে রক্তকণিকা পরীক্ষারগ স্টেইন আবিষ্কৃত হলে লাভেরানের আবিষ্কার নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। যে পাস্তুর ইন্স্যটিটিউট ল্যাভেরনের কাজাকে স্বীকৃতি দেয়নি, তারাই তাঁকে সেখানে প্রটোজোয়া নিয়ে গবেষণারগ জন্য আমন্ত্রণ জানায়। ১৯০৭ সালে লাভেরান নোবেল পুরস্কার পান। ম্যালেরিয়ার পরজীবীর একাধিক প্রজাতি বিভিন্ন ধরনের জ্বর (কোয়ার্টান/টার্শিয়ান) সৃষ্টি করে এ ধারণা প্রতিষ্ঠিত করেন ইটালিয়ান নিউরোফিজিওলজিস্ট ক্যামেলিও গলগি (তিনিও নিউরোফিজিওলজির জন্যে নোবেল পান ১৯০৬ সালে)। ম্যালেরিয়ার সাথে দূষিত বাতাস, জলাভুমির সম্পর্কের হাজার বছরের ধাঁধী তবুও অমীমাংসিত থাকে। শত্রু চিনে গেছি আমরা কিন্তু শত্রুর গোপন মারণস্থ তখনও অজানা। পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো দেশে দেশে তখন হুমকির মুখে। ফ্রেঞ্চ কলোনির চেয়ে বৃহৎ শক্তি তখন একটাই-ব্রিটিশ এম্পায়ার। ব্রিটিশ রাজ্যের সীমানায় সূর্য কখনো অস্ত যায় না। বাংলা বিহার উড়িষ্যা পাটনা দিল্লীর মসনদ সবখানে অপ্রতিদ্বন্দ্বি ব্রিটিশ। পশ্চিমারা এই উপমহাদেশে ভয় পেত শুধু দুটো জিনিসকে, এক বাংলার বাঘ, দুই ম্যালেরিয়া। ব্রিটিশ প্রশাসনে তোড়জোড় তখন ম্যালেরিয়কে কিভাবে দমন করা যায় সেটা নিয়ে।

ইন্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসের ডা রোনাল্ড রস অন্য সব বিজ্ঞানীর মত শুরুতে ডা লাভেরানের আবিষ্কারে সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু ডা রোনাল্ড রসের শুরু সার প্যাট্রিক ম্যানসনের (ইনাকে ট্রপিকাল মেডিসিনের জনক বলা হয়) সমসাময়িক একটি আবিষ্কার ডা রোনাল্ড রসকে ম্যালেরিয়া নিয়ে কাজ করতে উৎসাহিত করে। স্যার প্যাট্রিক ম্যানসনই প্রথম জানান, যে জীবাণু (এলিফেন্টিয়াসিস বা গোদ রোগ) মানুষকে আক্রান্ত করে, সেটা মশার শরীরেও থাকে। ডা রোনাল্ড রস স্যার প্যাট্রিক ম্যানসনের কাজের সূত্র ধরে।

ডা. চার্লস ল্যাভেরনের ম্যালেরিয়া জীবাণু কীভাবে মানুষের দেহে আসে সেটা নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। ইন্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিস তাঁকে মাদ্রাজ থেকে ম্যালেরিয়ামুকত অঞ্চলে বদলী করলে তিনি পদত্যাগ করতে চান নিজ গবেষণার প্রতি এতটাই নিবেদিত ছিলেন ডা রোনাল্ড রস। অবশেষে তাঁকে সরকার এক বছরের জন্য ম্যালেরিয়া এবং কালাজ্বর ইনভেস্টিগেশনে বিশেষ দায়িত্বে নিযুক্ত করে।

১৮৯৭ সালে সেকেন্দ্রাবাদে এক এনোফিলিস মশাকে ব্যবচ্ছেদ করে মশার পাকস্থলিতে ম্যালেবিয়ার জীবাণু পান ডা রস এবং পরিবর্তিতে পাখির উপর গবেষণা করে প্রমাণ করেন, ম্যালেরিয়া জীবাণুর জন্য

মশা ইন্টারমিডিয়েট হোস্ট হিসেবে কাজ করে। ডা রোনাল্ড রস ১৯০২ সালে মেডিসিনে নোবেল পুরস্কার পান।

আজ ১০০ বছর পরে আমরা পৃথিবী থেকে ম্যালেরিয়া নির্মূলের জন্য যে কাজ করছি, তার ভিত্তি রচিত হয়েছিল ডা রোনাল্ড রসের আবিষ্কারের মাধ্যমে। সুয়েজ খাল, পানামা খাল খননের মূল বাঁধা ছিল শ্রমিকদের ম্যালেরিয়া, যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ডা রোনাল্ড রসের শরণাপন্ন হয়েছিল তৎকালীন নির্মাণ কর্তৃপক্ষ। ১৯০৬ সালে মোট ২৬,০০০ শ্রমিক পানামা খাল খননে কর্মরত ছিল যাদের মাঝে ২১,০০০ জনকে তাঁদের কর্মকালে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল। প্রতি ১০০০ জনে মৃত্যু হার ছিল ১১.৫৯। পরবর্তিতে ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি শুরু করার পর মৃত্যু হার কমে ১.২৩ হয় প্রতি হাজার জনে।

আমেরিকা তখন পৃথিবীবাসীর কাছে এক 'নতুন পৃথিবী' কলম্বাস এবং তাঁর উত্তরসূরি অভিযাত্রীরা আবিষ্কার করেছেন নতুন ভূখণ্ড। অভিযাত্রীদের সাথে দাস প্রধার মহাজনেরা যেমন পা রাখল, এসেছিল খৃস্টান মিশনারিরাও। ধর্মপ্রচার, অশিক্ষিত বর্বর মানুষদের শিক্ষিত সুসভ্য করার পাশাপাশি চিকিৎসার দায়িত্বও নিয়েছিল মিশনারিরা। তারা খেয়াল করলো স্থানীয় ইন্ডিয়ানরা এক ধরনের গাছের বাকল ব্যবহার করে জ্বরের চিকিৎসায়। যে কাঁপুনি জ্বরে পৃথিবী নাকাল হয়ে আছে, সে জ্বর থেকে মুক্ত আদিবাসী রেড ইন্ডিয়ানরা। পেরুরর ভাইসরয়ের স্ত্রী, কাউন্টেস ওফ সিনকোন-এর জ্বরের চিকিৎসায় সে গাছের বাকল ব্যবহার করেছিল স্প্যানিশ মিশনারিরা। রানীর রোগমুক্তিতে গাছের নামকরণই করা হয় সিনকোনা, পৃথিবী পেল ম্যালেরিয়ার প্রথম অব্যর্থ ওষুধ-কুইনাইন (১৯৫৮)। ১৯৬৭ সালের দিকে নর্থ ভিয়েতনামের স্বাধীনতাকামীরা চীনের মাও সেতুং-কে অনুরোধ করে ম্যালেরিয়ার চিকিৎসায় চাইনিজ ভেষজ ওষুধ দেওয়ার জন্য, মাও সে তুংয়ের আদেশে ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা গবেষনায় তোড়জোড় শুরু হয়। হাজার বছর পর ১৯৭১ সালে পৃথিবীর মানুষ সেই ঔষুধের কথা জানতে পারল, তখনকার চীন আমেরিকার পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে হেনরি কিসিঞ্জারের চীন সফর উপলক্ষে।

ম্যালেরিয়া সংক্রমণ আবিষ্কারের স্মরণে ২০ আগস্ট বিশ্ব মশা দিবস পালিত হয়। ১৮৯৭ সালে, একজন ব্রিটিশ ডাক্তার স্যার রোনাল্ড রস, যিনি ব্রিটিশ ভারতের আলমোড়ায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, আবিষ্কার করেছিলেন যে সংক্রামিত মশা তাদের পরিপাকতন্ত্রে ম্যালেরিয়া পরজীবী বহন করে এবং তারা যাকে কামড়ায় তাদের অন্যান্য প্রাণীদের কাছে তা ছড়িয়ে দেয়। রস তার আবিষ্কারের জন্য ১৯০২ সালে ফিজিওলজি এবং মেডিসিনে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এই আবিষ্কারের পর, রস ঘোষণা করেন যে ২০ আগস্ট বিশ্ব মশা দিবস হিসাবে পরিচিত হওয়া উচিত। রস তার নোবেল বিজয়ী আবিষ্কার করেন যখন তিনি ম্যালেরিয়া রোগীকে কামড়ানো একটি মশার পাকস্থলীর টিস্যু ছিন্ন করে সেখানে ম্যালেরিয়া পরজীবী খুঁজে পান। সেই সময়ে, রস সেকেন্দ্রাবাদে কাজ করছিলেন, এখন ভারতের তেলেঙ্গানার একটি শহর। রস দেখিয়েছিলেন যে মহিলা অ্যানোফিলিস ম্যালেরিয়া পরজীবী দিয়ে মানুষকে সংক্রামিত করেছিল।

এখন, আমরা জানি যে ম্যালেরিয়া, ১২৫ টিরও বেশি বিভিন্ন প্রজাতির ম্যালেরিয়া পরজীবী সহ, এটি বিশ্বের সবচেয়ে সর্বব্যাপী রোগগুলির মধ্যে একটি এবং এটি মানুষ ছাড়াও সরীসৃপ এবং পাখিদের মধ্যেও পাওয়া যায়। এখন আমরা এটাও জানি যে মশা হল সবচেয়ে মারাত্মক প্রাণী যা বছরে ৭,৫০,০০০ মৃত্যুর জন্য দায়ী। ওয়ার্ল হেলথ অর্গানাইজেশনের মতে, শিশুরা ম্যালেরিয়ায় সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠী, ৬৭% মৃত্যুর জন্য দায়ী।

কলেরা

১৮১৭-২৪ অবধি পূর্বভারত বারবার আক্রান্ত হয়েছে কলেরায়। কখনও তীব্র, কখনও মাঝারি রোগের প্রকোপ থেকে গিয়েছে। পূর্ব ভারত থেকে তা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়েছিল দক্ষিণপূর্ব এশিয়া এবং সেখান থেকে সুদূর পশ্চিম এশিয়ায়, পূর্ব আফ্রিকা ও ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলেও।১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে কলেরার অতিমারি প্রথম দেখা গিয়েছিল তৎকালীন কলকাতায়। একে বলা হয় 'ফার্স এশিয়াটিক কলেরা প্যান্ডেমিক' বা 'এশিয়াটিক কলেরা'। চিকিৎসাশাস্ত্রের গবেষকদের ধারণা, কুম্ভমেলা পরবর্তী সময়ে কলেরা ছড়িয়ে পড়েছিল উচ্চ গাঙ্গেয় বদ্বীপ থেকে। তারপর সেই রোগ ব্রিটিশ সৈন্য, নৌবাহিনী ও বাণিজ্যতরীর মাধ্যমে পৌঁছে গিয়েছিল অন্যান্য মহাদেশে।

অবশেষে ১৮২৪ ক্রিস্টাব্দে কলেরার দুর্বার গতি প্রতিহত করা সম্ভব হয়। মনে করা হয়, ১৮২৩-এর শেষে যে তীব্র ঠান্ডা পড়েছিল তাতেই অনেকটা নিষ্ক্রিয় হয়ে আসে কলেরার জীবাণু। এই অতিমারিতে কত জন প্রাণ হারিয়েছিলেন, তার সঠিক পরিসংখ্যান এখন পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয় কলেরা-অতিমারি শুরু হয়েছিল ১৮২৬-এ। এরও উৎসস্থল মনে করা হয় পূর্বভারতের গাঙ্গেয় বদ্বীপকেই। তারপর তা বাণিজ্যপথ ধরে ছড়িয়ে পড়ে ভারতের অন্য শহরে এবং ক্রমে অন্যান্য দেশে। সেই দফায় কলেরার আক্রমণ অব্যাহত ছিল ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দ অবধি।

১৮৪৬-এ আবার ফিরে এল কলেরা। এ বার আগের থেকে আরও ভয়াবহ রূপে। তৃতীয় দফায় অতিমারি জারি ছিল ১৮৬০, কোথাও কোথাও ১৮৬৩ অবধিও। এই কলেরা-অতিমারিকে ধরা হয় উনিশ শতকের ভয়ঙ্করতম অতিমারি হিসেবে।

এ বারও কলেরা ছড়িয়েছিল ভারতের গাঙ্গেয় বদ্বীপ থেকেই। তারপর তা পৌঁছে গিয়েছিল এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা এবং উত্তর আমেরিকাতেও। ১৮৫৪ সালে এর প্রভাব ছিল সবথেকে ভয়াবহ। শুধু গ্রেট ব্রিটেনেই প্রাণ হারিয়েছিলেন ২৩ হাজার মানুষ।

কী ভাবে ছড়িয়ে পড়ত কলেরা?

এ নিয়ে তখন দ্বিধাবিভক্ত ছিলেন বিশ্বজুড়ে চিকিৎসকরা। আধুনিক গবেষকদের ধারণা, তখনও বহু দেশে মূলত নদীর জলই পানীয় জল হিসেবে ব্যবহার করা হত। তার থেকেই ছড়িয়ে পড়েছিল অসুখ। তা ছাড়া, বিশ্বজুড়ে মানুষের পরিযাণ বা মাইগ্রেশন কমবেশি জারি থাকে কমবেশি সবসময়েই। ফলে তাদের এবং দেশান্তরে যাওয়া সৈন্য ও ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে রোগের ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগত না।

৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে গাঙ্গেয় বদ্বীপ থেকে কলেরা পুণ্যার্থীদের মাধ্যমে পৌঁছে গিয়েছিল পশ্চিম এশিয়ায়। প্রথম বছরে প্রাণ হারিয়েছিলেন ৩০ হাজার তীর্থযাত্রী। পাশাপাশি, রোগ ছড়িয়েছিল আফ্রিকা ও ইউরোপ মহাদেশেও। চতুর্থ দফার কলেরা অতিমারি পৃথিবীতে স্থায়ী হয়েছিল ১৮৬৩ থেকে ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দ অবধি।

পঞ্চম দফায় কলেরা-অতিমারি ভারতে শুরু হয়েছিল ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে। তারপর তা ছড়িয়ে পড়েছিল এশিয়ার অন্য অংশ, ইউরোপ এবং দক্ষিণ আমেরিকায়।

ষষ্ঠ কলেরা-অতিমারি দেখা দিয়েছিল ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে। দেশ জুড়ে প্রাণ নিয়েছিল প্রায় ৮০ হাজার মানুষের। তবে এ বার আর গাঙ্গেয় বদ্বীপ নয়। মনে করা হয়, সে বার অতিমারির উৎস ছিল হরিদ্বারের কুম্ভমেলা। এ দফায় ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে প্রশমিত হয় কলেরা প্রকোপ।

সপ্তম কলেরা-অতিমারি শুরু হয়েছিল ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে। এ বার আর ভারত নয়। কলেরার উৎস ছিল ইন্দোনেশিয়া। সেখান থেকে তৎকলীন পূর্ব পাকিস্তান (আজকের বাংলাদেশ)হয়ে রোগের জীবাণু প্রবেশ করে ভারতে।

গত দু'শো বছরে মোট সাতবার কলেরা অতিমারিতে আক্রান্ত হয়েছে ভারত-সহ গোটা বিশ্ব। ১৮১৭ থেকে ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ অবধি কলেরা-অতিমারিতে ভারতে প্রাণ হারিয়েছেন দেড় কোটির বেশি মানুষ। ১৮৬৫ থেকে ১৯১৭ অবধি এই পরিসংখ্যান ছিল দু'কোটি ৩০ লক্ষ।

ওয়ালডেমার হাফকিন একজন রাশান ইহুদি, যিনি কাজ শুরু করেন ওডেসা শহরে। পরে প্যারিসে গিয়ে তিনি আরও অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। সে সময়টাতে অণুজীববিজ্ঞান নিয়ে লোকের মনে ছিল ঘোর সন্দেহ। ১৮৯৪ সালের মার্চ মাসে ওয়ালডেমার হাফকিনের সামনে নতুন একটি সুযোগ আসে। কলকাতায় ব্রিটিশ ভারত সরকারের মেডিকেল অফিসার তাকে সেখানে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান। শহরের একটি বস্তির পুকুরে কলেরার ব্যাসিলাই জীবাণু রয়েছে কিনা, তা শনাক্ত করতে তাকে সাহায্য করতে হবে। বস্তিবাসী সব পরিবার ওই পুকুর থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করতো। ফলে তারা নিয়মিতভাবে কলেরায় আক্রান্ত হতো। মি. হাফকিনের কাছে তার নতুন তৈরি টিকার কার্যকারিতা পরীক্ষার জন্য এসব বস্তি ছিল আদর্শ এক জায়গা। বস্তির প্রতিটি বাড়ির অবস্থা একই রকম। বাসিন্দারা সবাই একইভাবে কলেরায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে ছিলেন।

তিনি যদি প্রতিটি পরিবারের বাছাই করা কয়েক জনকে টিকা দেন এবং বাকিদের টিকা না দেন, তাহলে যথেষ্ট সংখ্যক পরিবারের ওপর তার এই পরীক্ষা থেকে একটা অর্থপূর্ণ ফলাফল পাওয়া যাবে বলে তিনি আশা করছিলেন।

মার্চ মাসের শেষ নাগাদ কলকাতার কাঁঠালবাগান বস্তিতে দু'জন লোক কলেরায় আক্রান্ত হন। এটা ছিল নতুন প্রকোপের প্রথম ইঙ্গিত।

ওয়ালডেমার হাফকিন বস্তিতে চলে যান এবং বস্তির প্রায় ২০০ জন বাসিন্দার মধ্যে ১১৬ জনকে তার তৈরি টিকা দেন। তার টিম পরে লক্ষ্য করে যে বস্তির আরও ১০ জন কলেরায় আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু এদের কাউকেই টিকা দেয়া হয়নি। এদের মধ্যে ১০ জন মারা যায়।

এই ফলাফলে আশান্বিত কলকাতার স্বাস্থ্য কর্মকর্তা আরও কয়েকটি জায়গায় এই নতুন টিকার পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু সাধারণ মানুষকে টিকা নিতে রাজি করানো ছিল একটা কঠিন কাজ।

ভারতে ব্রিটিশ স্বাস্থ্য সেবা ছিল জোর করে চাপিয়ে দেয়ার এক ব্যবস্থা। এর প্রতি মানুষের আস্থা ছিল কম। আর টিকা জিনিসটা সম্পর্কেই মানুষের কোন ধারণা ছিল না।

এই সমস্যা সমাধানে মি. হাফকিন একটা কৌশল বের করলেন। তিনি ব্রিটিশ শ্বেতাঙ্গ ডাক্তারদের বাদ দিয়ে ডা. চৌধুরী, ডা. ঘোষ, ডা. চ্যাটার্জি এবং ডা. দত্তদের মতো ভারতীয়দের সাথে নিয়ে কাজ শুরু করলেন। প্রথম দিকে বাধা এলেও এক সময়ে মি. হাফকিনের কলেরা টিকা নেয়ার জন্য লোকে লাইন দিতে

শুরু করেছিল,ভারতীয় ডাক্তারদের সাথে নিয়ে তিনি দিনরাত বস্তিতে বস্তিতে ঘুরতে শুরু করেন। বস্তির মজদুররা কাজে বেরুনোর আগে তিনি তাদের টিকা দিতেন।

তিনি আরও একটা কৌশল তৈরি করলেন সেটা হলো, তার উদ্ভাবিত টিকা জনসমক্ষে তিনি নিজের দেহে প্রয়োগ করলেন। উদ্দেশ্য দেখানো যে এটা নিরাপদ। কলকাতার বস্তিতে এই পরীক্ষার মধ্য দিয়ে মি. হাফকিন স্বল্প সংখ্যক বিজ্ঞানীদের একজনে পরিণত হন, যারা বিশ্বব্যাপী মহামারিকে কীভাবে বুঝতে হয় আর কীভাবে এর মোকাবেলা করতে হয় সেটা শিখেছিলেন।

যক্ষ্মা ভারতের প্রধান জনস্বাস্থ্য সমস্যাগুলির মধ্যে একটি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) অনুমান অনুসারে, ভারতে বিশ্বের বৃহত্তম যক্ষ্মা মহামারী রয়েছে। ২০২০ সালে, সারা বিশ্বে টিবি মামলার ২৬% ঘটনা ভারতে ছিল। ভারতে প্রতি ১০০,০০০ জনসংখ্যার মধ্যে ১৯২টি ঘটনা ঘটে। এইচআইভি-নেগেটিভ লোকেদের মধ্যে বিশ্বব্যাপী টিবি মৃত্যুর ৩৮% এবং এইচআইভি-নেগেটিভ এবং এইচআইভি-পজিটিভ লোকেদের সম্মিলিত মোট টিবি মৃত্যুর ৩৪% জন্য ভারতে দায়ী। আরও ২০২০ সালে, আনুমানিক টিবি ঘটনা এবং নতুনভাবে টিবি ধরা পড়া এবং রিপোর্ট করা লোকের সংখ্যার মধ্যে ভারত বিশ্বব্যাপী ব্যবধানের ২৪% জন্য দায়ী।

যে ব্যাকটেরিয়া টিবি ঘটায় তাকে মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস বলে। একজন ব্যক্তি অজান্তেই এই ব্যাকটেরিয়া অর্জন করতে পারে এবং এটি তাদের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকতে পারে, এটি নিষ্ক্রিয় যক্ষ্মা নামে পরিচিত। সক্রিয় যক্ষ্মা শুরু হয় যখন ব্যাকটেরিয়া বিকাশ শুরু করে এবং লক্ষণ ও উপসর্গগুলি দৃশ্যমান হতে শুরু করে। যদিও টিবি ব্যাকটেরিয়া শরীরের যেকোনো অঙ্গকে (যেমন, কিডনি, লিম্ফ নোড, হাড়, জয়েন্ট) সংক্রমিত করতে পারে, তবে এই রোগটি সাধারণত ফুসফুসে হয়। সমস্ত যক্ষ্মা রোগের প্রায় ৮০% ফুসফুস বা ফুসফুসের সাথে সম্পর্কিত।

সময়ের সাথে সাথে এবং প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান পরিশীলিততার সাথে টিবিতে ভারতের প্রতিক্রিয়া পরিবর্তিত হয়েছে। টিবি-র প্রতিক্রিয়া বিকশিত হয়েছে, প্রাক-স্বাধীনতা থেকে স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে বর্তমান WHO-এর সহায়তায়। ১৯১৪ সালে আর্থার ল্যাঙ্কেস্টার দ্বারা যক্ষ্মা রোগের প্রথম জাতীয় গবেষণা করা হয়েছিল। দ্য টিউবারকিউলোসিস অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া হল একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা যা ১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি ভারত সরকারের অনুমোদিত এবং টিবি দিল্লি কেন্দ্রের সাথে কাজ করছে।

স্বাধীনতার পর, ভারত সরকার বিভিন্ন আঞ্চলিক ও জাতীয় যক্ষ্মা কমানোর কর্মসূচি প্রতিষ্ঠা করে। ভারত সরকারের সংশোধিত ন্যাশনাল টিবি কন্টোল প্রোগ্রাম (আরএনটিসিপি) ভারতে ১৯৯৭ সালে শুরু হয়েছিল। এই প্রোগ্রামটি টিবি চিকিতার বিষয়ে ধারণা এবং ডেটা বিকাশের জন্য ডব্লিউএইচও-প্রস্তাবিত ডাইরেক্টলি অবজারভড ট্রিটমেন্ট শর্ট কোর্স (ডটস) কৌশল ব্যবহার করেছিল। এই গোষ্ঠীর প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল নতুন রোগীদের মধ্যে ভারতে অন্তত ৮৫% টিবি চিকিতা সাফল্যের হার অর্জন করা এবং বজায় রাখা।

ঔপনিবেশিক ভারতে মহামারী ও টিকাকরণ সম্পর্কে মনোভাব

ঔপনিবেশিক সময়ের উপর মহামারী সংক্রান্ত গবেষণায় দেখা যায় যে ১৮৯৬ থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে, ৩০ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ মহামারী রোগের শিকার হয়েছিল-বুবোনিক প্লেগ, কলেরা, ম্যালেরিয়া,

গুটিবসন্ত এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা। এর মধ্যে প্রায় ১০ মিলিয়ন পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ এবং বোম্বাইয়ের অন্তর্গত।

পাঞ্জাব প্রায়ই কলেরা এবং প্লেগ প্রাদুর্ভাবের কেন্দ্রস্থল হিসেবে প্রমাণিত হয়। ১৮৯৬ এবং ১৯২১ সালের মধ্যে, এই ব্রিটিশ ভারতীয় প্রদেশে ১২টি বড় কলেরা প্রাদুর্ভাব রেকর্ড করা হয়েছিল, যার ফলে ০.২৫ মিলিয়ন মানুষ মারা গিয়েছিল। এই পরিসংখ্যানটি ম্যালেরিয়া, গুটিবসন্ত, প্লেগ এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা দ্বারা প্ররোচিত মৃত্যুর ব্যতীত।

যাইহোক, এটি ছিল ১৮৯৬ সালের বোম্বেতে প্লেগ যা সব থেকে মারাত্মক বলে প্রমাণিত হয়েছিল। প্লেগ অন্যান্য প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে সারা দেশে প্রায় ১২ মিলিয়ন মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, যার ফলে একটি তীব্র সামাজিক অব্যবস্থা ঘটে। এই ধরনের একটি বিপর্যয় ঔপনিবেশিক সরকারকে মহামারী মোকাবেলায় কঠোর পদক্ষেপের প্রস্তাব করতে বাধ্য করেছিল। মহামারী রোগ আইন, ১৮৯৭, যা এখনও একটি প্রত্নতাত্ত্বিক স্মারক হিসাবে দীর্ঘস্থায়ী, এই প্রস্তাবগুলির ফলাফল ছিল।

এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, রোগাক্রান্ত মামলার রিপোর্ট করার জন্য গুপ্তচর নিয়োগ করা হয়েছিল; সন্দেহভাজন রোগীদের আবাসস্থলে অভিযান চালানো হয়; ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামগুলো ঘেরাও করা হয়েছে এবং বাসিন্দাদের অস্থায়ী শিবিরে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। গ্রামের আধিকারিকদেরকে কোয়ারেন্টাইনে থাকা ক্ষতিগ্রস্থদের খাবার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহের জন্য দায়ী করা হয়েছিল। মজার বিষয় হল, জম্মু ও কাশ্মীরের মহারাজা একটি নীতি প্রবর্তন করেছিলেন যেখানে যারা সংক্রামিত ব্যক্তিদের তার অঞ্চলে আগমনের ঘটনা রিপোর্ট করেছিল তাদের আর্থিকভাবে পুরস্কৃত করা হবে এবং যারা মামলাগুলি গোপন করবে তাদের শাস্তি দেওয়া হবে।

যাইহোক, মহামারী নিয়ন্ত্রণ শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপের উপর নির্ভর করে না; এটি জনসাধারণের প্রতিক্রিয়ার উপরও নির্ভর করে। নিশ্চিতভাবেই, ঔপনিবেশিক এবং 'নেটিভ' স্বৈরাচারী কাঠামোর অস্তিত্বই ব্যাপকভাবে রিপোর্ট করা মৃত্যুর পিছনে প্রধান বাস্তব কারণগুলির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত (গণ দরিদ্রতা, প্রাথমিক চিকিৎসা পরিকাঠামো, দুর্বল স্যানিটেশন, বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব, শিক্ষাগত অনগ্রসরতা ইত্যাদি)। 'কুখ্যাতভাবে নোংরা', 'অসংবেদনশীল' এবং 'বর্বর' হিসাবে লোকেদের ঔপনিবেশিক স্টেরিওটাইপিংও একটি ভূমিকা পালন করেছিল।

যাইহোক, অন্যান্য কারণগুলিও ছিল যা মহামারী নিয়ন্ত্রণে বাধা দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে অবদান রেখেছিল। এর মধ্যে রয়েছে গতিশীলতা, জমায়েত এবং মানুষের পক্ষ থেকে লুকিয়ে রাখা, যে কারণগুলি এখনও মহামারী বিস্তারের জন্য অনেকাংশে দায়ী।

সেই সময়ে, মণ্ডলীর অভ্যাসের মতো শ্রমের গতিশীলতা একটি অবিরাম ঘটনা ছিল। যদিও রাজ্য ক্ষতিগ্রস্ত-অপ্রভাবিত অঞ্চল জুড়ে মানুষের চলাচল কমানোর জন্য ব্যবস্থা নেবে, তবে এটি সম্পূর্ণ লকডাউন কার্যকর করতে পারেনি কারণ এতে ঔপনিবেশিক কোষাগারকে অনেক বেশি ব্যয় করতে হবে। মহামারী-আক্রান্ত এলাকার ক্ষেত্রকে যেটা প্রসারিত করেছিল তা হল আধুনিক পরিবহনের প্রবর্তন।

প্রকৃতপক্ষে, কাশ্মীর থেকে কিছু উদাহরণ উদ্ধৃত করার জন্য, ১৯ শতকের শেষের দিকে পরিবহন ও যোগাযোগের মাধ্যম গড়ে উঠলে উপত্যকায় মহামারীর ফ্রিকোয়েন্সি এবং প্রভাব বৃদ্ধি পায়। ১৮৮৮ থেকে

১৯০০ সালের মধ্যে, তিনটি বড় মহামারী এই অঞ্চলে আঘাত হানে, যার ফলে হাজার হাজার মৃত্যু ঘটে (১৮৮৮ সালে ১০,০০০; ১৮৯২ সালে ১১,৭১২; ১৯০০ সালে ৪,২৫৬)। প্রাসঙ্গিকভাবে, ১৮৮৮ সালের মহামারীটি জম্মু থেকে মহারাজার শিবির দ্বারা "আমদানি করা" হয়েছিল যখন ১৯০০ সালের মহামারীটি পাঞ্জাবে উৎপত্তি হয়েছিল।

অন্যদিকে, গোপন করাও একটি গুরুতর সমস্যা ছিল যা প্রশাসনকে মোকাবেলা করতে হয়েছিল। এটি মূলত তাদের উতে প্রাদুর্ভাবের নিয়ন্ত্রণকে বাতিল করে দেয়। কিন্তু আড়াল কেন? যেমন ডেভিড আর্নল্ড, ঔপনিবেশিক ভারতে মহামারী নিয়ে তার গবেষণায় যুক্তি দিয়েছেন, 'অধিপ্রবেশকারী' রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা ও স্যানিটারি ব্যবস্থা এড়াতে 'প্লেগ ব্যবস্থার প্রতি ভারতীয় প্রতিরোধ শারীরিক চুরি বা আড়ালকরণের চারপাশে আবর্তিত'। ইরা ক্লেইন এবং সাশা ট্যান্ডনের মতো অন্যান্য গবেষণাও দেখায় যে মহামারী চলাকালীন সরকারী 'হস্তক্ষেপের' বিরুদ্ধে জনগণের বিরোধিতা সংকটকে আরও তীব্রতর করেছে।

মজার বিষয় হল, জোরপূর্বক বিচ্ছিন্নতার ভয় এবং রোগের বাহক হওয়ার সাথে যুক্ত কলঙ্ক মানুষকে তাদের লক্ষণযুক্ত আত্মীয়দের 'নিরাপদ' এলাকায় পাচার করতে প্ররোচিত করে, তাদের অ্যাটিক, আলমারির ভিতরে, আসবাবের নীচে বা গোপন কক্ষে লুকিয়ে রাখে যখনই রাষ্ট্রের অনুসন্ধান দল প্রদর্শিত হয়েছে. এই কৌশলগুলির কিছু এখনও আমাদের সমাজে প্রতিনিয়ত হয়।

এই বিশ্বাসের দ্বারা উদ্দীপিত হয়েছিল যে মহামারীগুলি মানুষের মধ্যে ব্যাপক পাপের শাস্তি দেবার উপায়কে নির্দেশ করে। অর্থোডক্স মুসলমানরা ভয় করত যে মহামারী বিরোধী পদক্ষেপের কাছে 'আত্মসমর্পণ' তাকদীরের নীতির (পূর্ব গন্তব্য); ব্রাহ্মণরা তাদের বর্ণের জন্য ভয় পেত; রাজপুত ও মুসলমানরা তাদের নারীদেরকে পরদা ছাড়া দেখতে দিতে পারত না; জৈনরা, অহিংসার প্রতি তাদের চরম বিশ্বাসের সাথে, বুবোনিক প্লেগের সময় ইঁদুর মারার ধারণাটিকে ঘৃণা করেছিল।

আংশিকভাবে, এটি রোগীদের ঘিরে ফেলা এবং মৃতদেহ নিষ্পত্তি করার উদ্দেশ্যে মোতায়েন ঔপনিবেশিক সৈন্যরা কীভাবে সংক্রামিত শিকার এবং মৃতদেহগুলিকে অব্যবস্থাপনা করেছিল তার ফলাফল। স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের দ্বারা মৃতদেহের বাধ্যতামূলক পরিদর্শনের জন্য তাদের দীর্ঘ সময়ের জন্য আটকে রাখা দরকার ছিল, যাকে লোকেরা 'ধর্ম দ্বারা নিন্দিত' বলে মনে করেছিল। এমনকি মানুষ টিকা প্রতিরোধ করবে, এই বিশ্বাস করে যে এটি 'যৌন ক্ষমতার ধ্বংস' ঘটায় এবং ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র তাদের নির্মূল ও দাসত্ব করতে চায়। কিছু প্লেগ-আক্রান্ত পকেটে, দাঙ্গা হয়েছিল (উদাহরণস্বরূপ গুরুদাসপুর, পাতিয়ালা এবং শিয়ালকোটে ১৯০১) কারণ লোকেরা বাধ্যতামূলক হাসপাতালে ভর্তি এবং কোয়ারেন্টাইন প্রত্যাখ্যান করেছিল।

সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১) Discuss the spread of Cholera as a epidemic in Colonial India.

২) What is the role of Sir Ronald Ross in the research of Malaria treatment?

৩) What was the popular belief about epidemics and treatment in India.

পর্যায়-৪

Growth of medical education

Unit 4.1 Early initiatives : native medical institutes.

Unit 4.2 Calcutta Madras, Sanskrit College.

Unit 4.3 Establishment of Calcutta Medical College

বিন্যাসক্রম

৪০৩.১.১ উদ্দেশ্য

৪০৩.১.২ 1

৪০৩.১.৩ ১

৪০৩.১.১ Early initiatives : native medical institutes

ঔপনিবেশিক স্বার্থে এদেশে প্রথম হাসপাতাল চালু হয় ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে। এটি প্রেসিডেন্সি জেনারেল বা পি. জি. হাসপাতাল নামে পরিচিত। এখানে মূলত ব্রিটিশ সেনাবাহিনী, কোম্পানির কর্মচারীদের চিকিৎসা করা হত। পরবর্তীকালে ১৭০৭ সালে তৈরী হয় কলকাতা পুলিশ হাসপাতাল। সালটা সম্ভবত ১৮৩৪ কি ১৮৩৫। হেমন্তের এক ভোরবেলা। তখনও সূর্য ওঠেনি ভাল করে। কলকাতায় ঘুম ভাঙেনি। ডা: মার্টিন কিন্তু অভ্যেস মতো বিছানা ছেড়েছেন আঁধার থাকতেই। একটু আলো ফুটতেই প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে চললেন রাজপথ ধরে। হঠাৎ কী মনে হতে এগিয়ে গেলেন বড়বাজারের এক গলিতে। ঢুকতেই নাকে রুমাল চাপা দিতে হত। আবদ্ধ নোংরা জল দেখে গুলিয়ে উঠল শরীরটা। এরপর শুধু বড়বাজার নয়, ডা: মার্টিন ঘুরে বেড়ালেন কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকায়। বাদ গেল না তখনকার শহরতলি 'ইন্টালি' এবং বালিগঞ্জও। বেছে বেছে গরিব মানুষের কুঁড়েঘরে ঢুঁ মারলেন কলকাতার জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য। জানতে চেষ্টা করলেন, তাঁদের অসুখবিসুখের কারণের সঙ্গে কলকাতার সার্বিক পরিবেশের কোনও সম্পর্ক আছে কি না।

বেশ কিছু দিন ধরে তথ্য সংগ্রহের পর ১৮৩৭ সালে প্রকাশ পেল তাঁর বিখ্যাত বই 'নোটস অন দ্য মেডিক্যাল টেপোগ্রাফি অব ক্যালকাটা'। গ্রন্থটি উনিশ শতকের কলকাতার জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত অফুরন্ত তথ্যের ভাণ্ডার, যদিও লেখকের দু-একটি মন্তব্য যথেষ্ট বিতর্কিত। কিন্তু আজ থেকে প্রায় দুশো বছর আগে তিনি বিশ্বের মানুষকে সচেতন করতে যে আস্তবাক্যটি উচ্চারণ করেছিলেন তার মর্মার্থ আজ একুশ শতকের বিশ্ববাসী উপলব্ধি করছে প্রতি মুহূর্তে। জে পি গ্রান্ট-এর এক প্রশ্নের উত্তরে লেখক মন্তব্য করেন, "ইন অল কাট্রিজ ইট ইজ ম্যান হিমসেল্ফ দ্যাট মেকস হিজ ক্লাইমেট।"

কে এই ডা: মার্টিন? পুরো নাম জেমস রেনাল্ট মার্টিন। ১৮১৭ সালে বেঙ্গল মেডিক্যাল সার্ভিসে যোগ দেন তিনি। যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে, সে সময় তিনি কলকাতার নেটিভ হাসপাতালের প্রেসিডেন্ট সার্জেন। মার্টিন তাঁর বইয়ে কলকাতার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের উপরে আলোকপাত করতে গিয়ে এ দেশের মানুষের জীবনচর্যার সমালোচনা করেছেন গভীর ক্ষোভের সঙ্গে। কলকাতার বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে তাঁর অবিযোগগুলো একেবারে মিথ্যে নয়। নিমাইচাঁদ মল্লিকের নাতি রামরতনের বিয়ের সময় চিৎপুরের দু' মাইল রাস্তায় গোলাপজলের ছড়া দেওয়া হয়েছিল, নইলে ধুলো উড়বে, দুর্গন্ধ ছড়াবে যে! অথচ রাস্তার ধারে পগারের গায়ে সারি সারি খাটা পায়খানা। কলকাতার ধনীরা সামাজিক অনুষ্ঠানে অঢেল অর্থ ব্যয় করে, অথচ তাদের প্রাসাদতুল্য বাসভবনের সামনের গলি দিয়ে হাঁটাচলা দায়, মেন নোংরা আর দুর্গন্ধ। মার্টিন মনে করতেন, ইউরোপীয় জ্ঞান কিংবা পশ্চিমি স্বাস্থ্যবিধি প্রয়োগ করে কলকাতার জনস্বাস্থ্যের হাল ফেরানো যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত 'নেটিভ'দের জীবনচর্যার মজ্জাগত ত্রুটিগুলো অনড় হয়ে থেকে যাবে। মার্টিন ছিলেন কলকাতার 'নেটিভ' এলাকার অন্যতম সমীক্ষক। কলকাতার মানুষের স্বাস্থ্যহীনতার জন্য দায়ী এরকম প্রায় একুশটা ত্রুটির কথা তিনি উল্লেখ করেছেন তাঁর বইয়ে। সেগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল ঘিঞ্জি জনবহুল পরিবেশ, যথেষ্ট নিকাশি ব্যবস্থার অভাব, বিশুদ্ধ পানীয় জলের দুষ্প্রাপ্যতা, অনুপযুক্ত পোশাক, নিরামিষ খাদ্যাভ্যাস, দেশীয় চিকিৎসকদের অজ্ঞতা, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ এবং অবশ্যই হাসপাতালের অভাব। জলস্বাস্থ্যের পক্ষে সামাজিক রীতিনীতিগুলিও নিশ্চিতভাবে ক্ষতিকর। তবে সেই সঙ্গে 'নেটিভ' এলাকার প্রতি সরকারের উদাসীনতা ও চরম অবহেলা লক্ষ করে মার্টিন বিস্মিত না হয়ে পারেননি। মার্টিন লিখেছেন, সারা বাংলা থেকে মানুষ কলকাতায় আসত রুজির টানে। সামান্য আয় করে মাসে দু'আনা থেকে দু'টাকা ঘরভাড়া দিয়ে থাকত। অভাবের তাড়নায় প্রায় অর্থ-উলঙ্গ মানুষগুলোর শোওয়ার বিছানা থাকত না। তারা শুতো স্যাঁতসেঁতে মেঝের উপরে মাদুর পেতে। কলেরার মতো অসুখ হলে অন্যান্য সঙ্গীরা ওষুধ আনতে পারত না। মৃত্যু অবধারিত জেনে তাকে নদীর পাড়ে ফেলে রেখে চলে যেত তারা। কয়েক ঘণ্টা পরে মৃত্যু হলে শবদেহ চলে যেত শেয়াল-কুকুরের পেটে।

কলকাতার জনস্বাস্থ্যের এই শোচনীয় হাল দেখে মার্টিন মনে করেছিলেন, একটা 'ফিভার হাসপাতাল' খুব জরুরি। এর অভাবে শহর এবং শহরতলিতে হাজার হাজার মানুষের অকালমৃত্যু ঘটে প্রতি বছর। তিনিই প্রথম ফিভার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেন। আশা করেছিলেন, এরকম একটা প্রতিষ্ঠান সরকারি তহবিলের সাহায্য পাবে। এ প্রসঙ্গে তিনি এমন একটি মন্তব্য করেন যা রীতিমতো চমকপ্রদ : 'সরকারি টাকার আসল উৎস যারা, সেই জনগণের জীবন রক্ষার জন্যই সেই টাকা খরচ করার চেয়ে ভাল কারণ আমার জানা নেই।'

১৭০৭-এ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কলকাতার প্রথম হাসপাতাল স্থাপন করে। সেখানে চিকিৎসা হত সেনা, নৌ-বিভাগের কর্মচারী ও গরিব সাহেবদের। পরে গড়ে ওঠে নেটিভ হাসপাতাল, পুলিশ হাসপাতাল এবং জেনারেল হাসপাতাল। শেষেরটিতে কেবল সাহেবদেরই চিকিৎসা হত। বিভিন্ন কারণে নেটিভ হাসপাতাল

কলকাতার বাসিন্দাদের চিকিৎসার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। এ জন্য নেটিভ হাসপাতালের গভর্নররা ১৮৩৫ সালের ২০ মে টাউন হল-এ মিলিত হন এক সভায়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ডা: জ্যাকসন, ডা: নিকলসন, স্যার এডওয়ার্ড রেম্যান, স্যার চার্লস গ্রান্ট, লর্ড বিশপ প্রমুখ। এদেশীয়দের মধ্যে ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামকমল সেন, রাধাকান্ত দেব, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রুস্তমজি।

কিন্তু প্রথমেই বিতর্ক বাধে ফিভার হাসপাতাল কাদের জন্য তৈরি হবে সেই প্রশ্নকে ঘিরে। পুলিশ হাসপাতালের সার্জেন প্রস্তাব দেন, এই হাসপাতাল তৈরি হোক অবস্থাপন্ন বাবু এবং সাহেবদের ভৃত্যদের জন্য। নাকচ হয়ে যায় এই প্রস্তাব। ফিভার হাসপাতালের জন্য যে ফিভার কমিটি গঠিত হয়েছিল, তার বক্তব্য ছিল, বিশাল সংখ্যক মানুষ যখন জ্বর বা অন্য রোগে আক্রান্ত হয়, তখন নেটিভ হাসপাতাল সামলাতে পারে না। তাছাড়া, ধর্মীয় সংস্কার নেটিভদের বাধা দেয় এই হাসপাতালে আসতে। সেখানে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের চিকিৎসা হয়। পৃথক চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই।

তোড়জোড় শুরু হল ফিভার হাসপাতাল গড়ে তোলার জন্য। একটা উপসমিতি গঠিত হল। সেখানে কলকাতার বাসিন্দাদের মধ্যে থেকে সদস্য করা হল রামকমল সেন, রাধাকান্ত দেব ও রাজচন্দ্র দাশকে। পরে এই কমিটির অন্তর্ভুক্ত করা হয় রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, রসময় দত্ত, মথুরানাথ মল্লিক, মতিলাল শীল, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখকে। কিন্তু শেষপর্যন্ত মাত্র তিনজ নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন, বাকিরা দূরত্ব বজায় রেখেছিলেন। রামকমল সেন তো সদস্য পদেই ইস্তফা দেন। রাধাকান্ত দেবও গুটিয়ে নেন সহযোগিতার হাত।

গভর্নর জেনারেল লর্ড অকল্যান্ড সম্ভবত মার্টিনের বইয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। বিলেতের কর্তৃপক্ষকে লেখা তাঁর চিঠি পড়লে তা বোঝা যায়। কিন্তু সমস্যা হল হাসপাতালের জন্য অর্থ জোগাড় করতে গিয়ে। গভর্নর জেনারেল হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবে সায় দিলেও টাকার প্রশ্নে শক্ত, সরকারি টাকায় হাসপাতাল হওয়াটা তিনি পছন্দ করলেন না। পরিচালক সমিতিকে জানালেন, এই শহরের বরাবরের অভ্যেস সব ব্যাপারে সরকারের উপর নির্ভর করা। এই ধরনের দাতব্য প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশে মুক্তহস্তে দানধ্যানের মাধ্যমে হয়ে থাকে। তাঁর যুক্তি, ব্রিটিশ ভারতের সাধারণ রাজস্ব একটা স্থানীয় স্বার্থে ব্যয় করা অবিচার মাত্র। পরামর্শ দিলেন, হাসপাতাল করতে হলে স্থানীয় কর বসিয়ে করা হোক।

প্রায় আজকের বাজার অর্থনীতির প্রতিধ্বনি। মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররা অবশ্য স্বাধীনতা সংগ্রামের দিন থেকেই প্রতিবাদী। পরে, ১৯৩০ সালে পুলিশ কমিশনার চার্ল টেগার্টের গাড়িতে বোমা মারার জন্য নারায়ণ রায় ও ভূপাল বু নামে মেডিক্যাল কলেজের দুই ছাত্রের আন্দামানে দ্বীপান্তর হয়। ১৯৩৩ সালে এঁরা দুজন উল্লাসকর দত্ত ও সতীশ পাকড়াশির নেতৃত্বে ৪৫ দিন অনশন করেন কয়েকটি দাবিতে। যথাযথ খাবার, স্নানের জন্য সাবান ও পড়ার জন্য বই চাই। মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রদের অনশন-ঐতিহ্য আজকের নয়।

শুরুর কথায় ফিরে আসি। জনস্বাস্থ্যে কোম্পানির আমলে সরকার থেকে একটা পয়সাও খরচ করা হয়নি। যা করেছে, সবই লটারি কমিটি। লটারি কমিটির তহবিল গড়ে উঠেছিল প্রধানত সাহেবদের টাকায়। তারাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্রেতা, কারণ লটারি টিকিটের দাম এত চড়া ছিল যে এ দেশের খুব কম সংখ্যক মানুষ তা কিনতে পারতেন। ডা: মার্টিন বলেছিলেন, উনিশ শতকের কলকাতা লটারি কমিটির কাছে ঋণী, 'এই শহরের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সংস্কারগুলি নিশ্চিতভাবেই লটারি কমিটির পরিশ্রমের ফল।'

ফিভার হাসপাতাল গড়ে তোলার ব্যাপারে গভর্নর জেনারেলের অনীহা লক্ষ্য করে কলকাতার চিফ ম্যাজিস্ট্রেট ডেভিড ম্যাকফারলান সরকারকে চেপে ধরলেন। সরকারের দায়বদ্ধতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি প্রশ্ন ছুঁড়লেন, কেন, সরকার তো অনেক আগেই এই শহরের 'নেটিভ'দের জন্য সম্পূর্ণ সরকারি অর্থে মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করেছে। তা হলে, ফিভার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সরকার কেন অর্থ মঞ্জুর করবে না? সে সময় ইংল্যান্ডের অধীন আয়ারল্যান্ডও হাসপাতালের জন্য সরকারি সাহায্য পেত, সেটাও ম্যাকফারলান উল্লেখ করতে ভুললেন না।

সরকারি আধিকারিকদের যুক্তির ঠেলায় গভর্নর জেনারেল এবার একটু নরম হলেন। কিন্তু বিতর্ক শুরু হল অন্য প্রশ্ন ফিরে। কলকাতার পক্ষে কোনটা উপযোগী, হাসপাতাল না ডিসপেনসারি? সরকার চাইল ডিসপেনসারি। নেটিভ হাসপাতালে ৭৬০০ রুগির জন্য খরচ হয় ২১,৮৩৬ টাকা। আর মাত্র ১৭,১৩৫ টাকায় ১,৬১,০০০ রুগির চিকিৎসা হতে পারে ডিসপেনসারিতে। হিসেব কষে সরকারের মনে হয়েছিল, হাসপাতালের জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হবে, তা দিয়ে সাত-আটটা ডিসপেনসারি চালালে বেশি উপকৃত হবে গরিব মানুষ। ডা: মার্টিন হাসপাতাল ও ডিসপেনসারির উপযোগিতার মধ্যে পার্থক্য দেখিয়ে বললেন, কলকাতার মতো শহরে হাসপাতাল ছাড়া জ্বর এবং আমাশয়ের সুচিকিৎসা সম্ভব নয়। হাসপাতালে রুগির সুস্থ হয়ে ওঠার সব উপকরণ মজুত থাকে। পরিচ্ছন্ন ওয়ার্ড, উঁচু বিছানা, উপযুক্ত পথ্য, সবই হাসপাতালে সুলভ। ডিসপেনসারিতে রুগিকে ওষুধ দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করা সম্ভব নয়। ওষুধ নিয়ে রুগি ফিরে যায় সেখানেই, যেখানে সে রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। সেই স্যাঁতসেঁতে মেঝের উপরে শোয়, সঙ্গীরা যে খাবার আনে তা-ই খায়। সেখানে পরিচ্ছন্নতা বা মুক্ত আলো-বাতাসের বালাই নেই।

ডা: স্টিওয়ার্থ সরকারি বক্তব্যে ক্ষুব্ধ হয়ে মন্তব্য করলেন, 'ডিসপেনসারি নিয়ে আলোচনাটাই খুব দুঃখের ব্যাপার। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ এবং চমৎকার পরিকল্পনা থেকে নগণ্য বিষয়ে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার অপচেষ্টা।' ডা: নিকলসন বললেন, একমাত্র হাসপাতালের পক্ষেই সম্ভব আসন্ন মহামারির পূর্বাভাস পাওয়া, রোগ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা, মহামারির সময় কার্যকর ভূমিকা নেওয়া। আর মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রদের হাতে-কলমে চিকিৎসাশস্ত্রের প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের সুযোগ করে দিতে পারে একমাত্র হাসপাতালই। সেটা চিকিৎসার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ফিভার কমিটি আশা করেছিল, যেহেতু নেটিভদের জন্য এই হাসপাতাল তৈরির পরিকল্পনা, তাই তারা এগিয়ে আসবে আর্থিক সাহায্য নিয়ে। গভর্নর জেনারেলের প্রস্তাব মতো চাঁদা ও দানের রসিদ ছাপিয়ে বিলি করা হল সকলের মধ্যে। ডা: মার্টিন হাসপাতালের জন্য সাহায্যের আবেদন জানালেন সুদূর লুধিয়ানার ধনীদের কাছেও। কিন্তু এ দেশের মানুষের কাছ থেকে যে সাড়া মিলল, তা তেমন বলার মতো নয়। ম্যাকফারলান তাঁর প্রতিবেদনে লেখেন, 'নেটিভদের কাছে আমাদের যে আশা ছিল, তা ভীষণভাবে ধাক্কা খেয়েছে।' এ দেশের ষোলো জন ধনী দান করেছিলেন ২৮,৭০০ টাকা আর সাহেবরা দিয়েছিলেন ২৯,০২৩ টাকা। এ দেশের মানুষ তেমন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি, কারণ একটা সন্দেহ চেপে বসেছিল তাদের মনে। মাধব দত্ত এক হাজার টাকা দান করেছিলেন এই শর্তে যে, এক বছরের মধ্যে হাসপাতালের কাজ শুরু না করলে তাঁর অর্থ ফেরত দিতে হবে।

সংশয় দেখা দিল আর একটা প্রশ্নকে ঘিরেও। যাদের জন্য হাসপাতাল নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তারা কতটা সুযোগ গ্রহণ করতে এগিয়ে আসবে? এ দেশের অনেক মানুষের পাশ্চাত্য চিকিৎসায় আস্থা ছিল

না। হুতোম পদ্মলোচনের দেহত্যাগ প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'তিনি প্রকৃত হিন্দু, সুতরাং ডাক্তারী চিকিৎসায় ভারী দ্বেষ করতেন, বিশেষত তাঁর ছেলেবেলায় পর্যন্ত সংস্কার ছিল, ডাক্তারী ঔষধ মাত্রেই মদ মেশান, সুতরাং বিখ্যাত কবিরাজ মশাইদের দ্বারা নানা প্রকার চিকিৎসা করান হয় কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না...'। পদ্মলোচন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন তিনি রাত্তির গঙ্গার পাড়ে পড়ে থেকে।

এমনই আরও অনেক পদ্মলোচন ছিল তখন কলকাতার বর্ণহিন্দুদের মধ্যে। হাসপাতালে তাদের জাত-ধর্ম বলে কিছুই থাকবে না, এমন একটা আশঙ্কা ছিল তাদের মনে। ফিভার কমিটিরও অজানা ছিল না ব্যাপারটা। সে জন্য হাসপাতালে বর্ণহিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান ও ইহুদিদের জন্য পৃথক ওয়ার্ডের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। গরিবের কোনও সংস্কার ছিল না। তবে ব্যতিক্রম ছিল ওড়িয়া পালকিবাহকরা। বড্ড গোঁড়া ছিল তারা।

মেডিক্যাল কলেজ তৈরি হয়ে গিয়েছে আরও আগে, ১৮৩৫ সালে। ক্লাসও শুরু হয়েছে সে বছর ১ জুন থেকে। ডা: মাইন্টফোর্ড জোসেফ ব্রামলি ছিলেন কলেজের প্রথম সুপারিনটেন্ডেন্ট—তখনও 'অধ্যক্ষ' পদটি তৈরি হয়নি, সেটিই শীর্ষপদ। ডা: ব্রামলি ও ডা: গুডিভ, এই দুজন সাহেব শিক্ষক ছাড়া আরও দুজন এশীয় শিক্ষক ছিলেন, মধুসূদন গুপ্ত ও নবকৃষ্ণ গুপ্ত। দুজনেই পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যায় শিক্ষিত, মধুসূদন গুপ্ত তো ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন 'মেডিক্যাল কলেজে শবব্যবচ্ছেদকারী প্রথম ভারতীয়' হিসেবে। প্রাথমিকভাবে একটা পরীক্ষার মাধ্যমে মেডিক্যাল কলেজে ছাত্র ভর্তি নেওয়া হয়েছিল। জনা একশো প্রার্থীর অধিকাংশই ছিলেন হেয়ার স্কুল, হিন্দু কলেজ স্কচ অ্যাসেম্বলি স্কুল (এখন স্কটিশ চার্চ স্কুল) থেকে। মোট ৪৯ জনকে নেওয়া হয়েছিল 'ফাউন্ডেশন ছাত্র' হিসেবে।

ওদিকে হাসপাতালের প্রস্তুতি শেষ। এ বার প্রশ্ন উঠল, হাসপাতাল কোথায় হবে। অনেকগুলো প্রস্তাব এল। সেগুলোর মধ্যে ডা: ডব্লু. গ্রাহামের প্রস্তাবটা মনে ধরল কমিটির। তাঁর প্রস্তাব ছিল, মেডিক্যাল কলেজের আশেপাশেই কোথাও হাসপাতাল তৈরি হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাঁকে সমর্থন করলেন মেডিক্যাল কলেজের সচিব ডেভিড হেয়ার। ফলে কলেজ সংলগ্ন জমিতেই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। জমি দান করলেন মতিলাল শীল। ১৮৪৭ সালে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করা হল। পরের বছর, ১৮৪৮ সালে লর্ড ডালহৌসি হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন। তবে 'ফিভার' নামটা পেডিমেন্টের নীচে স্থান পেল না। তাতে লেখা হল 'মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল'। রুগি ভর্তি শুরু ১৮৫২ সালের ১ ডিসেম্বর থেকে।

ডা: মার্টিনের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অন্যান্য সাহেব চিকিৎসকদের সম্মিলিত আগ্রহ এই অসাধ্য সাধন করেছিল সরকারের উপর নিরন্তর চাপ সৃষ্টি করে। এক দশকেরও বেশি সময় ধরে সরকার ও সরকারি আধিকারিকদের মধ্যে যুক্তি-তর্কের অবিশ্রান্ত লড়াইয়ের শেষে সরকার বাধ্য হয়েছিল নতি স্বীকার করতে। ডিসপেনসারি নয়, হয়েছিল হাসপাতাল। সবটাই ইংরেজ রাজপুরুষদের কৃতিত্ব। যাঁরা সাহেবদের সমস্ত কাজের মধ্যে ঔপনিবেশিকতার গন্ধ পান, তাঁরা মনে করেন, কলকাতার উন্নয়নে কোম্পানির আধিকারিকদের আগ্রহ একটা রাজনৈতিক চাল মাত্র। উদ্দেশ্য, ঔপনিবেশিক সাসনের গ্রহণযোগ্যতা নেটিভদের কাছে তুলে ধরা। এই তত্ত্বে যাঁরা বিশ্বাসী, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লেখ্যাগারে সংরক্ষিত' জেনারেল কমিটি অব ফিভার হসপিটাল অ্যান্ড মিউনিসিপ্যাল ইমপ্রুভমেন্ট' শীর্ষক সাত খণ্ডের বিপুল পরিমাণ নথিপত্র একবার উল্টে দেখতে সরকার ও ফিভার কমিটির সদস্যদের মধ্যে লড়াইয়ের স্বরূপটা হয়তো এই সিদ্ধান্তে আসা যাবে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'ছোট ইংরেজ'রা সকলে ঔপনিবেশিক শাসনের অনুকল্প ছিলেন না।

৪০৩.৪.৪.২ Calcutta Madrasa, Sanskrit College

*কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন ওয়ারেন হেস্টিংস (ব্রিটিশ গভর্নর ১৭৭২-৮৫)। প্রতিষ্ঠাকাল ১৭৮১। মতান্তরে, ১৭৮০[৪]। প্রথম দেড় বছর প্রতিষ্ঠানটি নিজস্ব খরচে চালান হেস্টিংস। তারপর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পরিচালিত বাংলা সরকার এটি পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করে। কলকাতার বউবাজার অঞ্চলের বৈঠকখানায় এই কলেজের সূত্রপাত। পরে তালতলায় এর বর্তমান ঠিকানায় প্রতিষ্ঠানটি স্থানান্তরিত হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মাদ্রাসায় আর্থিক সংকট দেখা দিলে ১৮১৯ সালে কোম্পানি ক্যাপ্টেন এরোন নামে এক অবসরপ্রাপ্ত ব্রিটিশ সেনা আধিকারিককে নিয়োগ করেন মাদ্রাসা ম্যানেজমেন্ট কমিটির রাজস্ব বোর্ডকে সহায়তা করার জন্য। ১৮৫০ সালে আর্থিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় গুরুতর সংকট দেখা দিলে অ্যালোয়েস স্প্রাঞ্জার নামে অপর এক ইউরোপীয় মাদ্রাসার শীর্ষে স্থাপন করা হয়।

প্রথম দিকে এই কলেজে আইন, জ্যোতির্বিদ্যা, যুক্তিবিজ্ঞান, দর্শন, পাটিগণিত, জ্যামিতি, ছন্দবিজ্ঞান, ব্যাকরণ, ধর্মতত্ত্ব ইত্যাদি পড়ানো হত। ১৮২৭ সালে চিকিৎসাবিজ্ঞানের অধ্যাপক পি ব্রেটন এই কলেজে একটি মেডিক্যাল ক্লাস শুরু করেন। ১৮৩৬ সালে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত এই ক্লাস এই কলেজেই নেওয়া হত।

১৯২৭ সালটি বাংলার মুসলমান সমাজের শিক্ষার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বছরই অন্যান্য মাদ্রাসার সঙ্গে কলকাতা মাদ্রাসাতেও আলিম, ফাজিল, কালিম, মুমতাজুল মুহাদ্দেসিন প্রভৃতি শিক্ষাক্রমের সূচনা ঘটে।

*১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ ভারতে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় সংস্কৃত কলেজ। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির জন্য জনশিক্ষা উন্নয়নের জন্য ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। ১৮২৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ জুলাই গভর্নর জেনারেল কর্তৃক গৃহীত এক প্রস্তাবে এই বিষয়টি বিশেষ বিবেচনাধীন ছিল। এই প্রস্তাবটি কার্যকর করার জন্য একটি সাধারণ কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এই কমিটিতে এইচ. টি. প্রিন্সেপ, মেকলে ও এইচ. এইচ. উইলসন-এর মতো প্রাচ্যবিদ সহ দশজন সদস্য অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা প্রাচ্যদেশীয় বিদ্যা শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন। এই কারণে কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। মূলত সংস্কৃত কলেজকে এদেশীয় হিন্দুদের শিক্ষা প্রদান করার জন্য এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। তাই ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যদের ছাড়া অন্য সকল জাতকে শিক্ষার্থী হিসেবে এ বিদ্যাপীঠে প্রবেশ করতে না দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। এই কারণে রাজা রামমোহন রায় এই উদ্যোগের প্রচণ্ড বিরোধিতা করেন। তিনি ১৮২৩ খ্রিষ্টাব্দের ১১ ডিসেম্বর গভর্নর জেনারেলের কাছে দাখিলকৃত এক স্মারকলিপিতে কমিটির সিদ্ধান্তের বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন। তিনি সরকারের কাছে উপযোগী বিজ্ঞানের সাথে গণিত প্রাকৃতিক দর্শন, রসায়ন শাস্ত্র ও অঙ্গব্যবচ্ছেদবিদ্যাকে অন্তর্ভুক্ত করে অধিক উদারবাদী সবার জন্য শিক্ষাব্যবস্থার দাবি করেছিলেন। অবশ্য লর্ড আমহার্স্ট অবশ্য এ স্মারকলিপিটিকে বিশেষ গুরুত্ব দেননি।

১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি কলকাতার বউবাজার সট্রীটে একটি ভাড়া করা বাড়িতে সংস্কৃত কলেজ যাত্রা শুরু করে। কলেজের সচিব ছিলেন রসময় দত্ত এবং সহকারী সচিব ছিলেন রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার।

প্রথম দিকে শুধু ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যদের সংস্কৃত কলেজের ক্লাসে উপস্থিত থাকার অনুমতি দেওয়া হয়। ১৮২৭ খ্রিষ্টাব্দের ১লা মে প্রথমবারের মতো ইংরেজি ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে চালু হয়।

১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার মৃত্যুবরণ করেন। এরপর সহকারী সচিবের দায়িত্ব পান ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সচিব রসময় দত্তের অবসরগ্রহণের পর শিক্ষা পরিষদ সংস্কৃত কলেজকে কলকাতা মাদ্রাসার সম-মর্যাদা উন্নীত করে এবং বিদ্যাসাগরকে প্রথম অধ্যক্ষ নিয়োগ করে। ক্রমে ক্রমে এই কলেজের শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন করা হয়েছিল। এই সূত্রে প্রাকৃতিক দর্শন, ভূগোল ও ইতিহাসের ওপর লিখিত গ্রন্থাবলি বাংলায় অনুবাদের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। ধীরে ধীরে এই কলেজে অঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ-বিদ্যা, ইউরোপীয় চিকিৎসা-শাস্ত্র যুক্ত করা হয়েছিল। ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার পর এই কলেজ থেকে এই বিভাগটি তুলে দেওয়া হয়।

কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠানটিতে অনেক সংস্কার প্রবর্তন করেন। ১৮৫১ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কায়স্থদের এবং ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে সকল সম্মানিত হিন্দুদের জন্য কলেজের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়। এই সময় পরিমিত শিক্ষা ফি প্রবর্তন করা হয় এবং এর সঙ্গে শৃঙ্খলার ও নিয়মিত উপস্থিতির উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়।

১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের সিপাহি বিপ্লবের পরে কলেজের চতুষ্পার্শ্বস্থ অঙ্গনাদিসহ মূল ভবনকে সাময়িকভাবে যুদ্ধকালীন হাসপাতাল ও শুশ্রূষা কেন্দ্রে পরিণত করা হয়েছিল। ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অধ্যক্ষের পদ থেকে ইস্তফা দেন। এরপর অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করেন দীনবন্ধু শর্মা।

১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ কলেজটির তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষের ক্লাসসমূহ প্রেসিডেন্সি কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়। অবশ্য এই স্থানান্তরের প্রবল আপত্তি তুলেছিলেন ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের মতো দেশীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ। এই সময় হিন্দু আইনের অধ্যাপকের পদটি বিলুপ্ত করতে হয়। তবে মহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ২৫ জন অবৈতনিক ছাত্র নিয়ে কলেজের টোল বিভাগটি পুনরায় চালু করে সনাতন পদ্ধতিতে হিন্দুধর্মের পবিত্র গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত গ্রন্থসমূহের ব্যাখ্যা প্রদান করত।

১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে বিশিষ্ট পণ্ডিতদের নিয়ে সংস্কৃত পরীক্ষার একটি বোর্ড গঠন করা হয়। ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে কলেজের ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে এবং বঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতিসাধন গুরুত্বপূর্ণ প্রেরণা যোগাতে কলেজটির ভূমিকা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের রিপোর্টে (১৯১৭-১৯১৯) প্রশংসিত হয়। এরপর এফ.এ. পরীক্ষায় ইংরেজি, গণিত, সংস্কৃত, ইতিহাস ও যুক্তিবিদ্যার মতো বিষয়াবলি আবশ্যিক পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৯৩০-এর দশকব্যাপী দার্শনিক ও ইংরেজি ভাষায় সুপণ্ডিত ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত কলকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কলা বিভাগটি ইতঃপূর্বেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হয় এবং কলেজটিতে পালি, প্রাচীন ভারতীয় ও বিশ্ব ইতিহাস এবং ভাষাতত্ত্বের কোর্সসমূহ পড়ানো হত। সংস্কৃত ছাড়াও প্রাচ্যদেশীয় অথবা টোল বিভাগসমূহ এই কলেজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল। ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দে এই কলেজটির সম্প্রসারণ ঘটে বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে। এই কারণে বর্তমানে একে বলা হয়, সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়।

৪০৩.৪.৪.৩ Establishment of Calcutta Medical College

ভারতে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যা বা আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যার অগ্রগতিতে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম। ১৮৩৫ সালে মেডিকেল কলেজ, বেঙ্গল (বর্তমানে কলকাতা মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল) নাম নিয়ে এশিয়ার প্রথম ইউরোপীয় মেডিকেল কলেজ শুরু হয়। ১৮৩৫ সালের ২৮ জানুয়ারি লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের নেতৃত্বাধীন কমিটি ২৮ নং সরকারি আদেশবলে চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষার বিষয়ে বেশকিছু সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। তার মধ্যে গুরুত্বপূণ৪ সিদ্ধান্তগুলি হল—

১। আগামী ১ ফেব্রুয়ারি থেকে 'সংস্কৃত কলেজের মেডিকেল ক্লাস', মাদ্রাসার মেডিকেল ক্লাস এবং 'নেটিভ মেডিকেল ইনস্টিটিউশন' বন্ধ হয়ে যাবে।

২। চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে দেশীয় যুবকদের শিক্ষাদানের জন্য একটি নতুন মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হবে।

৩। ইংরাজি ভাষার মাধ্যমে সেখানে শিক্ষা দেওয়া হবে।

৪। ১৪ থেকে ২০ বছর বয়সি দেশীয় যুবকদের ওই প্রতিষ্ঠানে ফাউন্ডেশন পিউপিল হিসাবে ভর্তি করা হবে। ফাউন্ডেশন পিউপিলের সংখ্যা ৫০ জনের মধ্যে হতে হবে। তারা সরকার থেকে প্রথম শ্রেণির জন্য মাসিক ৭ টাকা, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির জন্য যথাক্রমে মাসিক ৯ টাকা ও ১২ টাকা ভাতা পাবে।

৫। তত্ত্বাবধায়কের (সুপারিন্টেনডেন্ট) বেতন হবে মাসি ১৩০০ টাকা। তত্ত্বাবধায়কের সহায়ক একজন ইউরোপীয় সহকারীর মাসিক বেতন হবে ৬০০ টাকা।

লর্ড বেন্টিঙ্ক তাঁর কাউন্সিল মাউন্টফোর্ড জোসেফ ব্রামালিকে নতুন মেডিকেল কলেজের তত্ত্বাবধায়ক (সুপারিন্টেনডেন্ট) পদে এবং হেনরি গুডিভকে তাঁর সহকারী পদে নিযুক্ত করেন। সংস্কৃত কলেজ থেকে মধুসূদন গুপ্ত ও আরও দুজন দেশীয় ব্যক্তিকে নতুন এই মেডিকেল কলেজে নিয়ে আসা হয়। আগে যে বাড়িতে পেটি-কোর্ট জেল বসত সেখানেই পরবর্তীকালে মেডিকেল কলেজটি স্থাপিত হয়।

অপরদিকে পূর্ণচন্দ্রদের মতে, হিন্দু স্কুলের উত্তর দিকে অ্যালবার্ট ইনস্টিটিউটে (বর্তমানে কফি হাউস, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা) আগে একটি কলেজ ছিল। বাবু রামকমল সেই ওই বাড়ির মালিক ছিলেন। ওই বাড়িতেই ১৮৩৫ সালের ১ জুন সোমবার (১২৪২ বঙ্গাব্দ, ১৯ জ্যৈষ্ঠ) মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়। মাসিক ভাড়া ছিল ৬০ টাকা। কলেজের নবনিযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক মাউন্টফোর্ড জোসেফ ব্রামলি ওই বাড়িতে একইসঙ্গে বাসও করতেন।

ডা: গুডিভের মতে, ১৮৩৫ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে মেডিকেল কলেজ স্থাপনের চেষ্টা শুরু হয়। ছাত্র বেছে নেওয়ার জন্য ১ মে শুক্রবার পরীক্ষা নেওয়া শুরু হয়। প্রথমে যে কয়েকজন ছাত্র নির্বাচিত হয়েছিল, সাহস করে তারা ভর্তি হতে পারেনি। কারণ তখনকার হিন্দু সমাজ শব ব্যবচ্ছেদের বিরোধী ছিল। অথচ পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানে শব ব্যবচ্ছেদ একটি প্রধান শিক্ষার বিষয়। তাই ইচ্ছা থাকলেও ছাত্ররা সমাজের ভয়ে এবং শব ব্যবচ্ছেদের চিন্তায় ইতস্তত করছিল।

ডা: মহেন্দ্রলাল সরকার 'ক্যালকাটা জার্নাল অব মেডিসিন' পত্রিকায় মন্তব্য করেছিলেন, ১৮৩৫ সালের ১ জুন (১৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২ বঙ্গাব্দ) প্রাচীন হিন্দু কলেজের পিছনে একটি পুরোনো বাড়িতে সর্বপ্রথম মেডিকেল কলেজ বসেছিল। শুরুর দিন তত্ত্বাবধায়ক (সুপারিন্টেনডেন্ট) সেই বাড়িতে প্রথম বক্তৃতা দেন।

অন্য সূত্র থেকে আরও জানা যায়, ব্রামলির প্রথম বক্তৃতায় ২০০ জনেরও বেশি ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এঁদের মধ্যে স্যার এডওয়ার্ড রেয়ন ও মি. শেক্সপিয়ারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ বাদেও বহু চিকিৎসক এবং তৎকালীন কলকাতার বহু সাহিত্যিকও ছিলেন। ব্রামলির বক্তৃতায় সন্তুষ্ট হয়েলর্ড অকল্যান্ড তাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়ে শুভেচ্ছা জানান।

অ্যালবার্ট ইনস্টিটিউটে/হলে মেডিকেল কলেজ কত দিন ছিল তার কোনো রেকর্ড পাওয়া যায় না। কয়েকজন ফাউন্ডেশন ছাত্রের কাছ থেকে জানা যায়, প্রায় ছ'মাস সেখানে মেডিকেল কলেজের কাজ হয়েছিল। প্রথম মেডিকেল ছাত্র উমাচরণ শেঠ ও দ্বারকানাথ গুপ্তের মতে ব্রামলির বক্তৃতার এক মাস আগে অ্যালবার্ট ইনস্টিটিউটের/হলের বাড়ি থেকে নতুন বাড়িতে মেডিকেল কলেজ উঠে আসে।

১৮৩৫ সালের ৫ আগস্ট ব্রামলির তত্ত্বাবধায়ক পদটির পরিবর্তন করে অধ্যক্ষ পদ করা হয় এবং ডা: গুডিভের সহায়ক পদটি অধ্যাপক পদে উন্নীত হয়। অধ্যাপক ডা: গুডিভকে ভেষজ ও শারীরস্থান পড়ানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়। নতুন অধ্যাপক হিসাবে উইলিয়াম ব্রুক ওসানেসি ১৮৩৫ সালের ১৫ আগস্ট যোগ দেন।

ওসানেসির উপর ওষুধ প্রস্তুতকরণ ও রসায়নশাস্ত্র পঠনপাঠনের দায়িত্ব ছিল। ওই বিষয়গুলি বাদে অধ্যক্ষ ব্রামলি শল্যচিকিৎসা ও শারীরবিদ্যা, ডা: গুডিভ পদার্থবিদ্যা এবং ওসানেসি উদ্ভিদবিদ্যা এবং প্রকৃতিবিজ্ঞানের পাঠন দিতেন। ছাত্রসংখ্যা ছিল ৫০ আর অধ্যাপক ছিলেন মাত্র ৩ জন। এত অল্পসংখ্যক অধ্যাপকের পক্ষে বহু বিষয় পড়ানো সম্ভব নয়, এই সমালোচনা প্রায়ই উঠে আসত তৎকালীন চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকায়।

১৮৩৬ সালে ১৯ মার্চ, শনিবার 'সমাচার দর্পণ'-এ প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায়, পুরোনো ভাড়া বাড়ি (রামকমল সেনের বাড়ি বা অ্যালবার্ট হল) থেকে ১৮৩৬ সালে ১৭ মার্চ, বৃহস্পতিবার, নতুন নিজস্ব বাড়িতে মেডিকেল কলেজ উঠে এসে চিকিৎসা শিক্ষালয়ের কাজ শুরু হয়। অবশ্য সরকারি ভাষ্য অনুসারে, ১৮৩৫ সালের মে মাসেই নতুন বাড়িতে মেডিকেল কলেজের কাজকর্ম শুরু হয়।

ছাত্রদের পরীক্ষার ফল খুবই সন্তোষজনক বলে উল্লেখ করেন অধ্যক্ষ ব্রামলি। ওসানেসির মতে, ছাত্রদের রসায়নশাস্ত্রের উত্তর বড়ো বড়ো পণ্ডিতদের দেখতে দেওয়া হলেও তাঁরাও তাদের উত্তরে কোনো ভুল ধরতে পারেননি। 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া'য় প্রকাশিত এক পথে কোনো এক চিকিৎসক মন্তব্য করেন, ছাত্রদের প্রশ্নের উত্তর পাঠ করে তিনি স্তম্ভিত ও বিস্মিত হয়েছেন। 'ইন্ডিয়ান জার্নাল অব মেডিকেল সায়েন্স'-এর সম্পাদক মন্তব্য করেন, ছাত্রদের উত্তর অতি সুন্দর ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচায়ক। মেডিকেল কলেজের পরীক্ষায় রসায়নশাস্ত্রের চারটি প্রশ্ন ছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য—

১। কোনো বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্ব বলেত কী বোঝায় তা বর্ণনা করো? জলের চেয়ে হালকা এমন কোনো ঘন বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় পদ্ধতির বর্ণনা দাও।

২। বিশ্লেষণ পদ্ধতিসহ সায়ানোজেন-এর রাসায়নিক ইতিহাস সম্পূর্ণ আলোচনা করো। প্রুশিক অ্যাসিড ও তার প্রতিষেধক এবং প্রুশিয়ান নীলের উৎপাদন প্রসঙ্গসহ হাইড্রোজেন, পটাশিয়াম ও লোহার সাথে তা কী কী যৌগ গঠন করে আলোচনা করো।

মেডিকেল কলেজ, কলকাতা।

১৮৩৭ সালের জানুয়ারি মাসে মাত্র ৩৪ বছর বয়সে অধ্যক্ষ মাউন্টফোর্ড জোসেফ ব্রামলি মারা যাওয়ার পর কর্তৃপক্ষ অধ্যক্ষপদ তুলে দিয়ে সেই টাকায় আরও অনেক অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। ওই অধ্যাপকদের নিয়ে একটি ফ্যাকালটি কাউন্সিল তৈরি হয় এবং ডেভিড হেয়ার কলেজের সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৮৩৭ সালের নভেম্বর মাস থেকে ১৮৩৮ পর্যন্ত কলেজের পঠনপাঠনের বিষয় ছিল—

প্রথম বিভাগে—শারীরস্থান ও শারীরতত্ত্ব, শারীরস্থান সংক্রান্ত ব্যবহারিক শিক্ষা, ব্যবহারিক শল্যচিকিৎসা, রসায়ন ও প্রকৃতিবিজ্ঞান সংক্রান্ত উদ্ভিদবিদ্যা।

দ্বিতীয় বিভাগে—ওষুধ সংগ্রহ, প্রস্তুতকরণ, এবং প্রয়োগ-সংক্রান্ত বিজ্ঞান, ভেষজের ব্যবহার, শারীরতত্ত্ব, শল্যচিকিৎসা ও রোগী শয্যাপার্শ্বক ওষুধ প্রয়োগ।

প্রতি শনিবার বেলা ১টায় সাপ্তাহিক পরীক্ষা হত। তাতে বিভিন্ন চিকিৎসক এবং দেশি ও বিদেশি গণ্যমান্য ব্যক্তি আমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত থাকতেন।

রোগীদের পর্যবেক্ষণের জন্য কলেজ সংলগ্ন একটি হাসপাতাল স্থাপন করতে মেডিকেল কলেজের কাউন্সির ১৮৩৮ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি শিক্ষা পরিষদের কাছে আবেদন করেন। এই প্রস্তাব সরকার অনুমোদন করলে কলেজের সহেগ ৩০ শয্যাবিশিষ্ট একটি হাসপাতাল স্থাপিত হয়। একইসঙ্গে বহির্বিভাগের রোগীদের জন্য একটি চিকিৎসাবিভাগও শুরু হয়। খোলার সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালটি রোগীতে পূর্ণ হয়ে যায় এবং বহির্বিভাগে প্রতিদিন বহু রোগী আসতে থাকে। এর ফলে সরকার একটি ১০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

যোগ্যতা এবং সিনিয়রিটির ভিত্তিতে ৭ থেকে ১২ টাকা পর্যন্ত মাসিক ভাতায় ৫০ জন ছাত্র সেখানে পড়াশোনা করত। ওই সব ছাত্রের মধ্যে ছিল—ব্রাহ্মণ ৫ জন, কায়স্থ ১৫ জন, বৈদ্য ৩ জন, স্বর্ণকার ২ জন, তাঁতি ৬ জন, বেনে ৮ জন, ওষুধ বিক্রেতা ১ জন, বিবিধ ১০ জন। সিংহল সরকারের থেকে ১০ জন ছাত্রকে এখানে পড়তে পাঠানো হয়েছিল।

১৮৩৮ সালের ৩০ অক্টোবর মঙ্গলবার পরীক্ষা শুরু হয়। তাতে ১১ জন ছাত্র পরীক্ষা দেয়। তাদের মাত্র ১ জন দিল্লির, নাম চুমনলাল। বাকি ১০ কলকাতার। ওই ১০ জনের মধ্যে জেমস পট নামে একজন খ্রিস্টান ছাত্রও ছিল। সাত দিন ধরে পরীক্ষা হয়েছিল। পরীক্ষা শেষ হয় ৯ নভেম্বর। প্রত্যেক ছাত্র এক এক করে ৩০ মিনিটের বেশি সময় ধরে পরীক্ষা দেয়। পরে সব ব্যবচ্ছেদের ঘরে প্রবেশ করে দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পর্কে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে। শারীরস্থান ও শারীরতত্ত্ব সম্পর্কে পরীক্ষায় উমাচরণ শেঠের পরীক্ষা সন্তোষজনক এবং ধীরস্থির হয়েছিল। অবশেষে দ্বারকানাথ ঠাকুর-সহ বেশ কিছু মানুষের উপস্থিতিতে উমাচরণ শেঠ, দ্বারকানাথ গুপ্ত, রাজকৃষ্ণ দে, শ্যামাচরণ দত্ত এবং নবীনচন্দ্র মিত্রের হাতে শংসাপত্র তুলে দেন প্রধান বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড রেয়ন।

১৮৪১-এ ডেভিড হেয়ার প্রতিষ্ঠানের সম্পাদকপদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং ডা: জব্লু. বি. ওসানেসি অস্থায়ীভাবে কলেজ সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। ডা: ওসানেসি সম্পাদকের পথ গ্রহণ করে হাসপাতালের পক্ষে প্রয়োজনীয় কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল যৌনব্যাধিগ্রস্ত রোগীদের আলাদা রাখা। ওষুধ সংগ্রহ, প্রস্তুতকরণ সংরক্ষণ ও মিশ্রণবিদ্যার ব্যবহারিক ক্লাস শুরু করা এবং ধাত্রীবিদ্যার হাসপাতালের কাজে মাসিক অনুদানের জন্য আবেদন করা হয়।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে এই মেডিকেল কলেজ তার অনুমোদন লাভ করে। এই কলেজের মেধাবী ছাত্রদের ইংল্যান্ডে প্রেরণ করে প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা হয়। ভারতে চিকিৎসাশিক্ষার ইতিহাসে কলকাতা মেডিকেল কলেজের অবদান অপরিসীম। এটি ছিল এশিয়া মহাদেশেরও দ্বিতীয় কলেজ। ধনী ও শিক্ষানুরাগী রামকমল সেন, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখের আর্থিক সহায়তায় হাসপাতাল ও কলেজের নতুন গৃহ নির্মিত হয়। এর চিকিৎসা পরিসেবা ও চিকিৎসা-গবেষণা ভারতের চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করে।

পর্যায়-৫

একক-১৩

বিন্যাসক্রম

৪০৩.১.১ উদ্দেশ্য

৪০৩.১.২ 1

৪০৩.১.৩ ১

৪০৩.৪.৫.১৩ উদ্দেশ্য

বর্তমান পর্যায় থেকে ছাত্র ছাত্রীরা বিভিন্ন খ্যাতনামী চিকিৎসকদের বিষয়ে জানতে পারবে।

পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত (১৮০০—১৫ নভেম্বর ১৮৫৬) বাঙালি হিন্দু বৈদ্য পরিবারের একজন অনুবাদক এবং আয়ুর্বেদিক। তিনি ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে সুশ্রুতের প্রায় ৩০০০ বৎসর পর ভারতীয় হিসেবে প্রথম পাশ্চাত্যরীতিতে শব ব্যবচ্ছেদ করেন।

জন্ম ও বংশপরিচয় : মধুসূদন গুপ্ত ১৮০০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন হুগলি জেলার বৈদ্যবাটী গ্রামের এক ঐতিহ্যবাহী বৈদ্য পরিবারের সন্তান। অনেক আগে থেকেই আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক হিসেবে তার পরিবারের সমাজিক পরিচিতি ও প্রতিপত্তি ছিল। তাঁর প্রপিতামহ বক্সী উপাধি পেয়েছিলেন। তার পিতামহ হুগলির নবাব পরিবারের গৃহচিকিৎসকও ছিলেন। প্রসঙ্গত ১৮০০ সালেই কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। তিনি ছোটবেলায় থেকেই খুব দুরন্ত প্রকৃতির ছিলেন এবং প্রচলিত নানা প্রথা বিরোধী কাজকর্মেই উৎসাহী ছিলেন। এমনকি তিনি প্রথাগত লেখাপড়াতেও অনুৎসাহী ছিলেন। তার পড়াশোনার অমনোযোগীয়তা কারণে কিশোর মধুসূদনকে তাঁর পিতা বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলেন।

শিক্ষা জীবন : প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পর ১৮২৬ সালে সংস্কৃত কলেজের বৈদ্যক বিভাগে ভর্তি হয়েছিলেন মধুসূদন গুপ্ত। শিক্ষাগ্রহণকালে তিনি আয়ুর্বেদে অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেন। পাশাপাশি তিনি সংস্কৃত, ন্যায়শাস্ত্র, অলংকার প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণ করেন ও যথেষ্ট বৈদগ্ধ্যের পরিচয় দেন। সংস্কৃত কলেজে ভর্তির আগে তিনি রাম কবিরাজ নামে এক বৈদ্যের কাছে রোগ নির্ণয় ও ওষুধ দেওয়ার প্রাথমিক শিক্ষা নেন। বিভিন্ন বৈদ্যের সঙ্গে গ্রামে গ্রামে রোগী দেখতে গিয়ে তিনি অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। এই অভিজ্ঞতা তাঁকে চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে ব্যুৎপত্তি অর্জনে পরবর্তীতে সাহায্য করেছিল।

সংস্কৃত কলেজে আয়ুর্বেদশাস্ত্র সম্পর্কে পাঠরত অবস্থায় তিনি শারীরতত্ত্ব সম্বন্ধে আকৃষ্ট হন। কাঠ বা মোম নির্মিত অস্থি দেখে ও বিভিন্ন জীবজন্তুর দেহ ব্যবচ্ছেদের মাধ্যমে ব্যবচ্ছেদ কার্যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

ডাক্তারি জীবনের সূত্রপাত ঘটে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের দিকে সংস্কৃত কলেজ থেকে বৈদ্যক বিভাগ বন্ধ করে দেওয়া হলে। যার ফলে ছাত্রদের মেডিকেল কলেজের ক্লাসে যেতে হয়। ছাত্র মধুসূদন ১৮৩৫ সালের ১৭ই মার্চ থেকে মেডিকেল কলেজের ডিমনস্ট্রেটরের কাজে নিযুক্ত হয়ে সহকারী অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন।কিন্তু সহপাঠীর কাছে শিক্ষা গ্রহণে ছাত্ররা আপত্তি করলে ছাত্রদের অসন্তোষ প্রশমনের জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ মধুসূদনকে ডাক্তারী ডিগ্রির চূড়ান্ত পরীক্ষা দিতে বলেন। ছাত্র মধুসূদন ডাক্তারী পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হলে কবিরাজ থেকে ডাক্তারে পরিণত হন। অধ্যয়নের পর, গুপ্ত একজন সংস্কৃত পণ্ডিত এবং একজন আয়ুর্বেদি চিকিৎসক হয়ে ওঠেন। তারপর, তিনি সংস্কৃত কলেজে শিক্ষক হন। তার সময়কালে, স্থানীয় ভারতীয়দের জন্য সংস্কৃত কলেজে আয়ুর্বেদ ও ইউনানি কোর্স পড়ানো হতো। হঠাৎ করেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেশীয় চিকিৎসা শেখার পদ্ধতি বাতিল করে দেয়। পরিবর্তে, তারা ১৮৩৫ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করে পাশ্চাত্য চিকিৎসার দ্বার উন্মোচন করে। ভারতে পশ্চিমা চিকিৎসা পদ্ধতির পদ্ধতিগত শিক্ষার জন্য এটিই ছিল প্রথম প্রতিষ্ঠান এবং অধিকন্তু এশিয়ায় ভারতীয়দের নিরাময়ের শিল্পে প্রশিক্ষণের জন্যও প্রথম প্রতিষ্ঠান। কলকাতা মেডিকেল কলেজ গুপ্তকে স্থানীয় শিক্ষক হিসেবে গ্রহণ করেছিল এবং তাকে পশ্চিমা চিকিৎসা নিয়েও পড়াশোনা করতে বলেছিল, যার ফলে তিনি হয়ে ওঠেছিলেন কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রথম শিক্ষার্থী।

মৌলিকভাবে, অ্যানাটমি বা শারীরস্থান ছিল পশ্চিমা চিকিৎসা শিক্ষার অন্যতম ভিত্তি এবং একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। যদিও দেশীয় কুসংস্কার কারণে সেসময় ভারতে মৃতদেহে স্পর্শ করা এবং ব্যবচ্ছেদ করা নিষিদ্ধ ছিল। তবে, গুপ্ত পাশ্চাত্য চিকিৎসায় অত্যন্ত আগ্রহ দেখিয়েছিলেন এবং সেই সাথে প্রশিক্ষণও গ্রহণ করেছিলেন। তৎকালীন বর্ণহিন্দুদের গোঁড়া কুসংস্কারের জন্য শবব্যবচ্ছেদ নিষিদ্ধ থাকলেও ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দের ১০ জানুয়ারি অথবা ২৮শে অক্টোবর কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রথা ভেঙে মহর্ষি সুশ্রুতের ৩,০০০ বছর পরে প্রথম বাঙালি হিসেবে ডাঃ হেনরি গুডইভের নির্দেশনায় মধুসূদন গুপ্ত কলকাতা মেডিকেল কলেজে শবব্যবচ্ছেদের মাধ্যমে শারীরতত্ত্ব সম্পর্কে নতুন অধ্যায় শুরু করেন এবং আধুনিক চিকিৎসা শিক্ষার অগ্রগতির দিকে প্রথম অভূতপূর্ব পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। এটি এশিয়ার প্রথম মানব ব্যবচ্ছেদ হিসেবেও স্বীকৃত ছিল। গুপ্তকে **'ব্রিটিশ ভারতের প্রথম ভারতীয় ব্যবচ্ছেদকারী'** হিসাবে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত করা হয়েছিল। এটি পশ্চিমা সভ্যতার একটি বড় বিজয় হিসাবে স্বীকৃত করা হয়েছিল। তাঁর সহকারী হিসেবে ছিলেন উমাচরণ শেঠ, রাজকৃষ্ণ দে, দ্বারকানাথ গুপ্ত ও নবীন চন্দ্র মিত্র।

মেডিকেল কলেজের হিন্দুস্থানী বিভাগকে ১৮৪৩-৪৪ খ্রিস্টাব্দে নতুনভাবে গড়ে তোলা হলে মধুসূদন গুপ্তকে সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদে নিযুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে বাংলা বিভাগ খোলা হলে তার দায়িত্বও তাঁকে দেওয়া হয়। আমৃত্যু দীর্ঘ ২২ বছর তিনি মেডিকেল কলেজের বাংলা বিভাগের সুপারিনটেনডেন্ট পদে বহাল ছিলেন। তিনি বয়ঃসন্ধি সম্পর্কিত গবেষণা করেন।ণ্ড

অনুবাদকার্য : সংস্কৃত কলেজে থাকাকালীন সময়েই তিনি অনুবাদের কাজ শুরু করেছিলেন। একটি সাধারণ ভারতীয় ভাষায় কিংবা একটি ধ্রুপদী ভারতীয় ভাষায় ইংরেজি থেকে অনুবাদ করা সহজ ছিল না এবং কীভাবে ইউরোপীয় বিজ্ঞানকে ভারতে প্রতিস্থাপন করা যায় তা নিয়ে অনেক দ্বিধা সৃষ্টি করেছিল। পণ্ডিতরা সচেতন ছিলেন যে শতাব্দী ধরে ভারতীয়রা যা শিখেছে তা মুছে ফেলা এবং পশ্চিমা তাত্ত্বিক কাঠামোর সাথে তাদের অদলবদল করা অসম্ভব।

সংস্কৃত কলেজে পাঠকালে বিভিন্ন ইংরেজি বই পড়ায় এনাটমি সম্পর্কে মধুসূদনের গভীর জ্ঞান অর্জন হয়। সংস্কৃত কলেজে পাঠকালে তিনি ১৮৩৪ সালে হুপারের লেখা *"Anatomistós Vade Mecum"* বইটি সংস্কৃতে অনুবাদ করেন। শারীরবিদ্যা শিরোনামে বইটি তিনি সম্পন্ন করেন। বইটি এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে ছাপানোর কথা হলেও বইটি কোন ভাষায় ছাপানো হবে এই নিয়ে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়, তবে শেষ পর্যন্ত বইটি সংস্কৃতে মুদ্রিত হয়।বইটি অনুবাদের জন্য তিনি ১০০০ টাকায় পুরস্কৃত হন। এছাড়াও তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে আরো কিছু বই অনুবাদ করেন।

মৃত্যু : তিনি ডায়াবেটিস মেলিটাস রোগে আক্রান্ত হলে তাকে শবব্যবচ্ছেদ করতে নিষেধ করা হয়। একটি ব্যবচ্ছেদ করার পর তিনি একটি সংক্রমণে আক্রান্ত হলে তার হাতে গ্যাংগ্রিন হয়। তবে শবব্যবচ্ছেদ সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণা করায় সেপ্টিসেমিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১৫ নভেম্বর মাত্র ৫৬ বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। কলকতা জাতীয় মেডিক্যাল কলেজ তার নামে অ্যানাটমিতে 'পন্ডিত মধুসূদন গুপ্ত মেমোরিয়াল লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করে।

রাধাগোবিন্দ কর (জন্ম ২৩ আগস্ট ১৮৫২-মৃত্যু ১৯ ডিসেম্বর ১৯১৮) : ব্রিটিশ ভারতের একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক।তার পিতার নাম ডাক্তার দুর্গাদাস কর। তার ভাই রাধামাধব কর ছিলেন একজন বিখ্যাত চিকিৎসক এবং সফল নাট্যব্যক্তিত্ব। রাধাগোবিন্দ কর হেয়ার স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করার পর চিকিৎসা বিজ্ঞানের পাঠ গ্রহণের জন্য কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হলেও নানা কারণে এক বছর পরে কলেজ ত্যাগ করেন। তিনি ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে পুনরায় কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন ও ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে উচ্চশিক্ষার্থে ইংল্যান্ড যান। ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসাশাস্ত্রে ডিগ্রীলাভ করে দেশে ফিরে আসেন।

ক্যালকাটা মেডিক্যাল স্কুলের প্রতিষ্ঠা : বাংলায় চিকিৎসাবিজ্ঞানের বই লেখা যে কলকাতা ও সংলগ্ন অঞ্চলের রোগীদের সমস্যার সমাধান নয়, তা ছাত্রাবস্থাতেই বুঝতে পেরেছিলেন রাধাগোবিন্দ। তাঁর এই উপলব্ধির আভাস পাওয়া যায় 'ভিষগবন্ধু' বইয়ের মুখবন্ধে। তিনি লিখেছিলেন, "যাহারা চিকিৎসা বিদ্যালয় হইতে সুশিক্ষিত ও কৃতকার্য হইয়া চিকিৎসা কার্যে প্রবৃত্ত হয়েন তাঁহারা যতই বুদ্ধিমান ও বিদ্বান হউন না কেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই বহুদর্শিতার অভাবে ব্যবস্থাপত্র প্রদান করিতে সহজে সক্ষম হন না।" সেই সময়ে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল গড়ে উঠলেও যে বহু রোগীই আসলে ঠিক চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হতেন, এ কথা জানতেন রাধাগোবিন্দ। ইউরোপীয় চিকিৎসা ব্যবস্থায় শিক্ষিত ডাক্তারদের মধ্যে ইউরোপীয় ডাক্তারেরা ভারতীয় রোগীদের অবজ্ঞাই করতেন। তাঁদের লক্ষ্য ছিল, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সৈন্য ও উপনিবেশে বসবাসকারী ইউরোপীয়দের স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখা। দেশের মানুষদের চিকিৎসা করতে গিয়ে পুরনো আয়ুর্বেদ চিকিৎসা ও সদ্য শেখা ইউরোপীয় চিকিৎসা এই দুই টানাপড়েনে পড়তেন বাঙালি চিকিৎসকেরাও। রাধাগোবিন্দ কর বুঝেছিলেন যে দেশের মানুষের চিকিৎসার জন্যে তাই শুধু নির্দেশিকা, পুস্তিকা বা বই প্রকাশ যথেষ্ট নয়। বরং প্রয়োজন গোটা একটি পৃথক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের। সেই কলেজ বা হাসপাতালটিকে হতে হবে ব্রিটিশ নিয়মাবলির ফাঁস থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এই উদ্দেশ্য সাধনে রাধাগোবিন্দের ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছিল তাঁর চিকিৎসা জীবনের প্রথম থেকেই। ১৬১ নম্বর পুরনো বৈঠকখানা বাজারের এক বাড়িতে তিনি কলকাতার তৎকালীন সেরা কয়েক জন বাঙালি চিকিৎসককে সঙ্গে নিয়ে একটি সমিতি স্থাপন করেন। সমিতির সদস্য ছিলেন মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, বিপিন মিত্র, কুমুদ

ভট্টাচার্য প্রমুখ। এই সমিতিতেই এশিয়ার প্রথম বেসরকারি মেডিক্যাল স্কুল তৈরির প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৮৮৬ সালে শুরু হয় স্কুল। নাম হয় 'ক্যালকাটা স্কুল অব মেডিসিন'। প্রথমে দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতি অনুসরণ করে শিক্ষাদান চলত। ১৮৮৭ সালে অ্যালোপ্যাথি বিভাগ শুরু হয়। নাম বদলে হয় 'ক্যালকাটা মেডিক্যাল স্কুল'। পরে বৈঠকখানা বাজার থেকে স্কুলবাড়ি স্থানান্তরিত হয় বৌবাজার স্ট্রিটে। ১৮৯০ সাল নাগাদ ব্রিটিশ সরকার স্কুলে শব ব্যবচ্ছেদের অনুমতি দেয়। প্রথম দিকে ক্যালকাটা মেডিক্যাল স্কুলে সমস্ত বিভাগেই পড়ানো হত বাংলায় লেখা বই। রাধাগোবিন্দ করের লেখা বইগুলি তো ছিলই, সেই সঙ্গে মধুসূদন গুপ্তের লেখা বইও ছিল পাঠ্যক্রমে। ক্রমে রাধাগোবিন্দ করের স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হতে থাকে। ২৯৮, আপার সার্কুলার রোডের ঠিকানায় স্কুলবাড়ি স্থানান্তরিত করা হয়। সেই সময়ে মেডিক্যাল স্কুল সংলগ্ন হাসপাতালে শয্যাসংখ্যা ছিল মাত্র ১৪! এর পরে স্কুল কর্তৃপক্ষ বেলগাছিয়ায় ১২ বিঘে জমি কেনে। যুবরাজ অ্যালবার্ট ভিক্টরের ভারত ভ্রমণের তহবিল থেকে আঠেরো হাজার টাকা সাহায্য মেলে। স্কুলের নিজস্ব বাড়ি তৈরি হয়। তবে তখনও সামান্য শয্যাসংখ্যার জন্য স্কুলে হাসপাতালের ব্যবস্থা পুরোদমে শুরু করা যায়নি। ১৮৯৯ সালে স্কুল সংলগ্ন হাসপাতালও তৈরি হয়। জন উডবার্ন হাসপাতালের উদ্বোধন করেন। তাঁর নামানুসারে হাসপাতালের নাম রাখা হয় 'অ্যালবার্ট ভিক্টর হাসপাতাল'। হাসপাতালে ডিসপেন্সারি গড়ে তোলার টাকা দেন বাবু মানিকলাল শীল। রাধাগোবিন্দ করের প্রথম বেসরকারি মেডিক্যাল স্কুল স্থাপনের কয়েক বছর পরেই আরও একটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি হয় 'কলেজ অব ফিজিশিয়ান্স অ্যান্ড সার্জন্স অব বেঙ্গল'। ১৮৯৫ সালে তৈরি এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ১৯০৪ সালে রাধাগোবিন্দ করের তৈরি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়। এই যৌথ প্রতিষ্ঠানটিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রূপে গড়ে তোলার প্রস্তাব পাশ হয় ১৯১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে। এই ভাবেই বহু উত্থান-পতন পেরিয়ে রাধাগোবিন্দ করের ছোট্ট চারাগাছটি মহীরুহ হয়ে ওঠে।

১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে এই স্কুলের নাম পরিবর্তন করে ক্যালকাটা মেডিক্যাল স্কুল রাখা হয় এবং ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে ডঃ রাধাগোবিন্দ কর ক্যালকাটা মেডিক্যাল স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে ক্যালকাটা মেডিক্যাল স্কুল এবং অপর একটি বেসরকারী চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কলেজ অব ফিজিসিয়ানস অ্যান্ড সার্জেন্স অব বেঙ্গল একত্রীভূত হয়ে দ্য ক্যালকাটা মেডিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ অব ফিজিসিয়ানস অ্যান্ড সার্জেন্স অব বেঙ্গল তৈরী হয় যাকে ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দের ৫ই জুলাই বেলগাছিয়া মেডিক্যাল কলেজ নামে উদ্বোধন করা হয়। ডঃ রাধাগোবিন্দ কর এর প্রথম সম্পাদক নির্বাচিত হন। বর্তমানে এই কলেজ তার নামানুসারে রাধাগোবিন্দ কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল (আর.জি.কর) নামে পরিচিত।

প্রকাশিত বই : রাধাগোবিন্দ কর বেশ কিছু ডাক্তারি বই রচনা করেছিলেন। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ধাত্রীসহায়, ভিষক সুহৃদ, ভিষক বন্ধু, সংক্ষিপ্ত শারীরতত্ত্ব, কর সংহিতা, সংক্ষিপ্ত ভৈষজ্যতত্ত্ব, প্লেগ, স্ত্রীরোগচিকিৎসা, স্ত্রীরোগের চিত্রাবলী ও সংক্ষিপ্ত তত্ত্ব, গাইনিকল্যাজি, সংক্ষিপ্ত শিশু ও বাল চিকিৎসা, রোগীর পরিচর্যা প্রভৃতি।

পর্যায়-৫

একক-১৪

বিন্যাসক্রম

৪০৩.১.১ উদ্দেশ্য

৪০৩.১.২ 1

৪০৩.১.৩ ১

৪০৩.৪.৫.১৪ উদ্দেশ্য

স্যার নীলরতন সরকার (১ অক্টোবর ১৮৬১-১৮ মে ১৯৪৩) : একজন বিখ্যাত চিকিৎসক ও শিক্ষাবিদ। তিনি বহু শিক্ষাসংস্থা এবং গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং এগুলি স্থাপনে সহযোগিতা করেছিলেন। তিনি একজন সক্রিয় রাজনীতিবিদ ছিলেন এবং শিল্পস্থাপনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন। ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে নীলরতন পূর্ববঙ্গের এক ব্রাহ্ম ধর্মপ্রচারক গিরিশচন্দ্র মজুমদারের মেয়ে নির্মলাকে বিবাহ করেন। তিনি অস্থি সংক্রান্ত চিকিৎসায় ভারতে প্রথম এক্স রশ্মির ব্যবহার করেন। কলকাতার বুকে মেডিকেল কলেজ স্থাপনের ক্ষেত্রে তিনি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। ১৯১৯ থেকে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে নীলরতন সরকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। এছাড়া তিনি বিশ্বভারতীর ট্রাস্টি বোর্ড এবং বসু বিজ্ঞান মন্দিরের আজীবন সদস্য ছিলেন।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার নেতড়াতে ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ১ অক্টোবর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার আদি নিবাস যশোহর। তার পিতার নাম নন্দলাল সরকার। নন্দলাল সরকার যশোরের একটি দরিদ্র কায়স্থ পরিবারের মানুষ ছিলেন। তিনি পরবর্তী কালে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার জয়নগরে থাকতে আরম্ভ করেন। বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক যোগীন্দ্রনাথ সরকার নীলরতন সরকারের ভাই।

নীলরতন সরকার ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে জয়নগর থেকে এন্ট্রান্স ও ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুল থেকে ডাক্তারি পাশ করেন। এর পর তিনি মেট্রোপলিটান কলেজ থেকে এলএ ও বিএ পাস করেন। ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করে তিনি ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে এমবি হন। এরপর ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দ এমএ এবং এমডি উপাধি পান।

মেট্রোপলিটান কলেজ থেকে এলএ ও বিএ পাস করে কিছুদিন তিনি চাতরা উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে থেকে এমবি হয়ে তিনি মেয়ো নেটিভ হাসপাতালে হাউস সার্জেনের পদে যোগ দেন। নীলরতন সরকার অল্প সময়ের মধ্যেই চিকিৎসক হিসাবে বিখ্যাত হন। তার পারিশ্রমিক দুই টাকায় আরম্ভ হয়ে আস্তে আস্তে ৬৪ টাকা অবধি হয়।গু১৭গু৩৭ তিনি দরিদ্র রোগীদের বিনা পয়সায় চিকিৎসা করতেন এবং তাদের বিনামূল্যে ওষুধ ও খাবার দিতেন। ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি

বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো এবং এরপর ফ্যাকাল্টি অফ সায়েন্স ও ফ্যাকাল্টি অফ মেডিসিনের ডিন হন। তিনি স্নাতকোত্তর কলা (১৯২৪ থেকে ১৯২৭ পর্যন্ত) ও বিজ্ঞান শিক্ষা বিভাগের (১৯২৪ থেকে ১৯৪৩ পর্যন্ত) সভাপতিও হয়েছিলেন।

১৮৯৫ সালে তিনি একটি বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করেন। ১৯১৬ সালে কলেজের নাম হয় কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ যা পরবর্তীতে আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল নামাঙ্কিত হয়। ১৯১৮ সালে মেডিকেল এডুকেশন সোসাইটি গঠিত হয় কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের বিভিন্ন বিষয় দেখাশোনা করার জন্য। নীলরতন ১৯২২ সালে এর সভাপতি হন। এবং ১৯৪১ সাল পর্যন্ত এই পদে ছিলেন।

নীলরতন ১৯০৮ সালে বুট অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট এর নির্দেশক হয়েছিলেন। বসু বিজ্ঞান মন্দির, বিশ্বভারতী এবং ভারতীয় জাদুঘরের ট্রাস্টি ছিলেন। ১৯১২ থেকে ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন।

তিনি সায়েন্স কলেজ অফ দ্য ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি এবং ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনের (জাতীয় শিক্ষা পরিষদ) স্থপতিদের মধ্যে ছিলেন। তিনি ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সম্পাদক হিসাবে তিনি এদেশে বৃত্তিগত প্রশিক্ষনের চেষ্টা করেছিলেন। বেঙ্গল টেকনিক্যাল স্কুল, যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রভৃতি স্থাপনেও তার ভূ মিকা ছিল। যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল (বর্তমানে কুমুদশঙ্কর রায় যক্ষ্মা হাসপাতাল) প্রতিষ্ঠায় তিনি সহযোগিতা করেছিলেন।

১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ছিলেন। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি লন্ডনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় সম্মেলনে যোগদান করেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডিসিএল এবং কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে এলএলডি উপাধি প্রধান করেছিল।

নীলরতন সরকারের দেশের সামগ্রিক উন্নতির প্রতি আগ্রহ তাঁকে বিভিন্ন শিল্প স্থাপনের দিকে উৎসাহিত করেছিল। তিনি রাঙামাটি চা কম্পানি (পরবর্তী কালে ইস্টার্ন টি কম্পানি), ন্যাশন্যাল সোপ ফ্যাক্টরি এবং ন্যাশন্যাল ট্যানারি কম্পানিতে তার টাকা নিয়োগ করেছিলেন। নীলরতন সরকার রাজনৈতিক ভাবে সক্রিয় ছিলেন। তিনি ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন।

নীলরতন সরকার এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরম বন্ধু ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক চিকিৎসক ও উপদেষ্টাও ছিলেন তিনি। কবি স্নেহভরে তাকে 'নীলু' নামে ডাকতেন। তিনি "সেঁজুতি" কাব্যগ্রন্থটি নীলরতন সরকারকে উৎসর্গ করেছিলেন। ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুল কলেজে রূপান্তরিত হয়ে তার নামে নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল নামাঙ্কিত হয়। ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ই মে গিরিডিতে তার মৃত্যু হয়।

স্যার কেদারনাথ দাস : ব্রিটিশ ভারতের একজন প্রসিদ্ধ ধাত্রীবিশারদ ছিলেন। কেদারনাথ হিন্দু স্কুল থেকে পড়াশোনা শেষ করে স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে এফ.এ পাশ করেন। তিনি ১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম.বি পাশ করার পরে ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্ত্রীরোগবিদ্যা ও ধাত্রীবিদ্যায় এম.ডি. ডিগ্রী পান।

কেদারনাথ প্রথমে কিছুদিন প্রেসিডেন্সী কলেজে স্বাস্থ্যবিধান সংক্রান্ত বিজ্ঞান নিয়ে অধ্যাপনা করার পর ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুলে ধাত্রীবিদ্যায় অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে সেখান থেকে অবসর গ্রহণের পর কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে স্ত্রীরোগবিদ্যা ও ধাত্রীবিদ্যার অধ্যাপক পদে যোগ দেন এবং ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে সেখানকার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং আমৃত্যু ঐ পদ অলংকৃত করেন।[৩] তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিতাবিদ্যা বিভাগের ডীন ছিলেন।

কেদারনাথ আমেরিকান গাইনিকোলজিক্যাল সোসাইটি এবং আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অব অবটেট্রিসিয়ান্স, গাইনিকোলজিস্টস অ্যান্ড অ্যাবডোমিনাল সার্জেন্স এর সাম্মানিক ফেলো ছিলেন। তিনি ব্রিটিশ কলেজ অব অবটেট্রিসিয়ান্স অ্যান্ড গাইনিকোলজিস্টস শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। তিনি ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যপদ গ্রহণ করেন।

কেদারনাথ দাসের কর্ম জীবনের প্রথম দিকে বহু ভারতীয় ও বিদেশী গবেষণা মূলক পত্রিকায় মধুমেহ, মস্তিষ্কের টিউমার, ধনুষ্টঙ্কার প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে তার প্রবন্ধ ছাপা হয়। ধাত্রীবিদ্যায় তার প্রথম গবেষণা মূলক পুস্তক এ হ্যান্ডবুক অব অবটেট্রিক্স ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে ছাপা হয়। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে তার দ্বিতীয় পুস্তক এ টেক্সটবুক অব মিডওয়াইফারী প্রকাশ হয়। ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রসবকালীন ফরসেপ্সের ওপর তার বিখ্যাত পুস্তক অবটেট্রিক ফরসেপ্স প্রকাশ হয়।

ভারতীয় মহিলাদের গঠনপ্রকৃতি ও অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের ভারতীয় শিশুদের কথা মাথায় রেখে কেদারনাথ এক বিশেষ ধরনের লম্বা ও বক্র প্রসবকালীন ফরসেপ্সের নির্মাণ করেন যা দাসের ফরসেপ্স নামে বিশ্বে প্রচলিত এবং এখনো ভারতে প্রসবকালে বহু ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই ফরসেপ্স অনুরূপ পশ্চিমী যন্ত্রগুলি অপেক্ষা ওজনে হাল্কা ও দৈর্ঘ্যে হ্রস্ব।

চিকিৎসাবিদ্যায় তার কর্মকাণ্ডের জন্য ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে তাকে কম্প্যানিয়ন অব দ্য অর্ডার অব দ্য ইন্ডিয়ান এম্পায়ার করা হয় এবং ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে ব্রিটিশ সরকার তাকে নাইটহুড খেতাব প্রদান করেন। ভারত ধর্মমহামণ্ডল তাঁকে "ধাত্রীবিদ্যার্ণব" উপাধি প্রদান করেন। কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে "সার কেদারনাথ দাস প্রসূতি হাসপাতাল" নামে পরিচিত বিভাগটি তারই প্রচেষ্টায় নির্মিত হয়। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম এফ.সি.ও.জি. উপাধিধারী।

স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী (১৯ ডিসেম্বর ১৮৭৩—৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬) : ব্রিটিশ ভারতের একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক এবং বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তিনি কালাজ্বরের ওষুধ ইউরিয়া স্টিবামাইন আবিষ্কার করেন। উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী ডাঃ নীলমণি ব্রহ্মচারী এবং শ্রীমতি সৌরভ সুন্দরী দেবীর ঘরে বিহারের মঙ্গির জেলার জামালপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তার জন্মের তারিখ ছিল ৭ই জুন, ১৮৭৫।তবে জানা গেছে যে ব্রহ্মচারী তার পরবর্তী জীবনে তার প্রকৃত জন্ম তারিখ ১৯ ডিসেম্বর, ১৮৭৩ উল্লেখ করেছেন। তার পিতা নীলমণি ব্রহ্মচারী ছিলেন জামালপুরে ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়েজের বেতনভুক্ত চিকিৎসক। তার নিবাস ছিল হুগলির মহেশতলায়।

ব্রহ্মচারীর প্রাথমিক শিক্ষা জামালপুরের ইস্টার্ন রেলওয়ে বয়েজ হাই স্কুলে হয়। জামালপুর থেকে কৃতিত্বের সাথে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর, ব্রহ্মচারী হুগলি কলেজে (বর্তমানে হুগলি মহসিন কলেজ) যোগদান করেন, যেখান থেকে তিনি গণিত ও রসায়নে অনার্স সহ ১৮৯৩ সালে বিএ পাস করেন। সেসময় একজন শিক্ষার্থীর পক্ষে দুটি বিষয়ে অনার্স পড়া সম্ভব ছিল। ব্রহ্মচারী তার বিএ পরীক্ষায় গণিতে

মেধার প্রথম হন। যদিও ব্রহ্মচারী গণিতকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন এবং এই বিষয়ে অত্যন্ত দক্ষতা দেখিয়েছিলেন, তবুও তিনি যথাক্রমে চিকিৎসা বিজ্ঞান ও রসায়ন পড়ার জন্য কলকাতা মেডিকেল কলেজ এবং কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগদান করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি ১৮৯৪ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে রসায়নে প্রথম শ্রেণীর সাথে এমএ ডিগ্রি পাস করেন।

স্যার আলেকজান্ডার পেডলার এবং আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় তাকে রসায়ন বিদ্যা শিখিয়েছিলেন। ব্রহ্মচারী আচার্য রায়ের দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত ছিলেন। ব্রহ্মচারীও সমান অধ্যবসায়ের সাথে তার চিকিৎসা পেশা চালিয়েছিলেন। ১৮৯৯ সালে তিনি এল.এম.এস. ডিগ্রি অর্জন করেন এবং পরের বছর তিনি এম.বি. ডিগ্রি নেন। তার এম.বি. পরীক্ষায় ব্রহ্মচারী মেডিসিন এবং অস্ত্রোপচারতে প্রথম হন এবং যার জন্য সম্মানসরূপ তিনি কিছু পদক লাভ করেছিলেন। ১৯০২ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। তখনকার দিনে এটি একটি বিরল পার্থক্য ছিল। এছাড়াও তিনি শারীরতত্ত্বে গবেষণার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি.এইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। তার থিসিসের শিরোনাম ছিল স্টাডিজ ইন হেমোলাইসিস (রক্তের লোহিতকণিকার ভাঙ্গণ), একটি কাজ, যা আজও লোহিত রক্তকণিকার শারীরবৃত্তীয় এবং শারীরসায়নিক বৈশিষ্ট্যগুলির উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসাবে বিবেচিত হয়। এছাড়াও তিনি কোট্স পদক, গ্রিফিথ পুরস্কার ও মিন্টো পদক পান।

১৮৯৯ খ্রিষ্ঠাব্দে তিনি প্রাদেশিক স্বাস্থ্যসেবায় যোগদান করেন। প্রথমে তিনি ঢাকা মেডিকেল স্কুল (বর্তমানে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ) এবং পরবর্তীতে ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুলে (বর্তমানে নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ) চিকিৎসক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯০৫ থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুলে ভেষজবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে এবং ১৯২৩ থেকে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে অতিরিক্ত চিকিৎসক হিসেবে কাজ করেন। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে সরকারী কাজ থেকে অবসর নিয়ে কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে ক্রান্তীয় ভেষজবিজ্ঞানের সাম্মানিক অধ্যাপক ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ-রসায়নের অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

১৯২০ সালে উপেন্দ্রনাথ তৈরি করেন ইউরিয়া স্টিবামাইন। ১৯২২ সালে ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ মেডিক্যাল রিসার্চে ৮ জন কালাজ্বর রোগীকে সুস্থ করার বিবরণসহ উপেন্দ্রনাথের আবিষ্কারের কথা প্রকাশিত হয়। তিনি তার গবেষণা পত্রে ওষুধটির বিষাক্ততা সম্পর্কে আলোচনা করেন। ১৯২৩ সালের জুলাই মাসে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেটে ইউরিয়া স্টিবামাইন সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশিত হয়। ১৯২৪ সালের এপ্রিল মাসে উপেন্দ্রনাথ আরো কিছু তথ্য প্রকাশ করেন ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেটে। কালাজ্বর ছাড়াও উপেন্দ্রনাথ ফাইলেরিয়া, ডায়াবেটিস, কুষ্ঠ, মেনিনজাইটিস প্রভৃতি নিয়েও গবেষণা করেছিলেন। চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধে রচনাবলীর মধ্যে ট্রিটিজ অন কালাজ্বর বিখ্যাত।

উপেন্দ্রনাথ ইংল্যান্ডের রয়্যাল সোসাইটি অফ মেডিসিনের সভ্য, ইন্দোরে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের (১৯৩৬) সভাপতি এবং নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি ব্রহ্মচারী রিসার্চ ইনস্টিটিউট স্থাপন করে দেশী ওষুধ প্রস্তুত করেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে গ্রিফিথ মেমোরিয়াল পুরস্কারে সম্মানিত করেছিল। স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড হাইজিন তাকে মিন্টো পদক দিয়েছিল। এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল তাকে স্যার উইলিয়াম জোনস

পদকে সম্মানিত করেছিল। এছাড়াও তিনি কাইজার-ই-হিন্দ স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন। ব্রিটিশ সরকার তাকে রায়বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করেছিল। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে উপেন্দ্রনাথ বর্হচারী নাইট উপাধি পান। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে তাকে মেডিসিনে নোবেল পুরস্কারের জন্য বিবেচনা করা হয়েছিল।

ইন্দুভূষণ বসু ডাঃ, যতীন্দ্র রামানুজাচার্য (১৮১২-১৮৯২—২৬-১২-১৯৭৫) : আকনা-হুগলী। রসিকলাল। সুচিকিৎসক ও পরম বৈষ্ণব। ১৯০৯ খী. কলিকাতার মিত্র। থেকে এন্ট্রান্স, ১৯১১ খ্রী. স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে আইএস-সি, এবং ১৯১৭ শী, কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে চারটি বিষয়ে অনার্স সহ পথম স্থান অধিকার করে এম.বি. পাশ করেন। পরের বছরই এমডি, পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করেন। স্বাধীনভাবে চিকিৎসা-ব্যবসায়ে প্রভূত সুনাম অর্জন করেছিলেন। ১৯১২—১৯৪৭ খ্রী. কারমাইকেল মেডিক্যাল (বর্তমান আর. জি. কর) কলেজ ও হাসপাতালের অবৈতনিক চিকিৎসক এবং অধ্যাপক ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিনের সদস্য, এশিয়াটিক সোসাইটির মেডিক্যাল সেক্রেটারী, ক্যালকাটা মেডিক্যাল জার্নালের প্রধান সম্পাদক প্রভৃতি দায়িত্বপূর্ণ কর্মভার পালন করেন। পরামর্শদাতা চিকিৎসক হিসাবে ভারতের বিভিন্ন পান্তে তাকে চিকিৎসার জন্য যাতায়াত করতে হত। ছাত্রাবস্থাতেই ধর্মজীবনের প্রতি আগহান্বিত ছিলেন। শাক্ত পরিবারের সন্তান হলেও ১৯১৯ শ্রী অযোধ্যার শ্রীশ্রীবলরাম স্বামীজী মহারাজের কাছে বৈষ্ণব মতে দীক্ষা নেন। ১৯৪৬ খ্রীঃ। তিনি খড়দহতে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণজিউর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯৪৮ খ্রীঃ থেকে সেখানে আশ্রমবাসীর জীবন যাপন করতে থাকেন। এ সময়ে তিনি পূর্বাশ্রমের নামও ত্যাগ করেন। মন্দিরকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে তিনি 'শ্রীবলরাম ধর্মসোপান' নামে এক বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। সর্বশাস্ত অধ্যয়ন, বেদান্ত-উপনিষদাদির ভাষ্য রচনা ও কীর্তনের মাধ্যমে জনসাধারণের মনে ভগবচ্চিন্তা উজজীবিত করার প্রয়াসী ছিলেন। কীর্তনাচার্য নবদ্বীপ বজবাসীর কাছে গরাণহাটি ধারার কীর্তন শিক্ষা করেন। তামিল ভাষায় লিপিবদ্ধ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের আকারগ্রন্থসমূহ থেকে জ্ঞানার্জনের জন্য তামিল ভা আয়ত্ত করে শীরঙ্গমে গিয়ে বিভিন্ন আচার্যের কাছে পাঠ নেন। বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্ত ও ইহার প্রাচীনত 'শ্রীবাচনভূষণ', 'শ্রীমদ্ভগবদগীতা রামানুজভাষ্য', 'মানব উজ্জীবন', 'শ্রীবৈষ্ণব দর্শন ও ধর্ম' প্রভৃতি ৬০ খানিরও বেশি গ্রন্থের রচয়িতা। কিছু প্রার্থনাসঙ্গীত ও পদ আখরও রচনা করেছেন। ১৯৫৪ খ্রী. থেকে মাসিক 'উজজীবন' পত্রিকা পকাশ করেন। মন্ত্রদীক্ষা দিতেন।

বিধানচন্দ্র রায় (১ জুলাই ১৮৮২—১ জুলাই ১৯৬২) : ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে আমৃত্যু তিনি ওই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। চিকিৎসক হিসেবেও তার বিশেষ খ্যাতি ছিল। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইংল্যাণ্ড থেকে এমআরসিপি এবং এফআরসিএস উপাধি অর্জন করার পর কলকাতার ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুলে (বর্তমানে নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ) শিক্ষকতা ও চিকিৎসা পেশা শুরু করেন। পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সদস্য, রয়্যাল সোসাইটি অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন অ্যান্ড হাইজিন এবং আমেরিকান সোসাইটি অফ চেস্ট ফিজিশিয়ানের ফেলো নির্বাচিত হন। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের ১ জুলাই বর্তমানে বিহার রাজ্যের অন্তর্গত পাটনার বাঁকিপুরে বিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম। তিনি ছিলেন পিতা প্রকাশচন্দ্র রায় ও মা অঘোরকামিনী দেবীর ছয় সন্তানের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। প্রকাশচন্দ্রের আদি নিবাস ছিল বর্তমান বাংলাদেশের খুলনা বিভাগের সাতক্ষীরা জেলার দেবহাটা উপজেলার শ্রীপুর গ্রামে। সরকারি চাকুরিজীবী প্রকাশচন্দ্র ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। বিখ্যাত ব্রাহ্মনেতা ও "নববিধান" ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা কেশবচন্দ্র সেন তার নামকরণ করেন "বিধান"।

ডাঃ বিধানচন্দ্রের লেখাপড়ার সূচনা হয়েছিল এক গ্রাম্য পাঠশালায়। পরে পাটনার টি কে ঘোষ ইনস্টিটিউশন এবং তারপর পাটনা কলেজিয়েট স্কুলে পড়াশোনা করেন। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে মাতৃবিয়োগের এক বছর পর প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পাটনা কলেজে ভরতি হন। সেখান থেকে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে এফএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তিনি। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে পাটনা কলেজ থেকে গণিতে সাম্মানিকসহ বিএ পাস করে তিনি কলকাতায় চলে আসেন। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে এলএমএস এবং দু-বছর পর মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে এমডি ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ড গিয়ে লন্ডনের বার্থোলোমিউ হাসপাতালে উচ্চশিক্ষার আবেদন করেন। প্রথমে এশীয় বলে তার আবেদন অগ্রাহ্য হয়। কথিত আছে নাছোড়বান্দা বিধানচন্দ্র ত্রিশ বার আবেদন করে সাফল্য পেয়েছিলেন। অথচ কেবল দু-বছর তিন মাস সময়কালে তিনি একসঙ্গে এমআরসিপি (লন্ডন) ও এফআরসিএস (ইংল্যান্ড) পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

তিনি ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় ফিরে প্রথমে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও পরে কারমাইকেল তথা আরজি কর এবং ক্যাম্পবেল তথা নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষকতা করেছিলন। এছাড়া তিনি কলকাতার চিত্তরঞ্জন সেবা সদন, চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতাল, ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশন এবং কমলা নেহরু হাসপাতাল এর সাথে যুক্ত ছিলেন।

১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে মহাত্মা গান্ধির ডাকে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মনোনীত হন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস প্রার্থীরূপে আইনসভায় নির্বাচিত হন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে গ্রহণ করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব। তিনি চারটি নতুন শহরের প্রতিষ্ঠা করেন দূর্গাপুর, বিধাননগর, কল্যাণী ও অশোকনগর-কল্যাণগড়। তার চোদ্দ বছরের মুখ্যমন্ত্রীত্বকালে নবগঠিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের প্রভূত উন্নতি সম্ভব হয়েছিল যে কারণেই তাকে পশ্চিমবঙ্গের রূপকার নামে অভিহিত করা হয়। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে তিনি ভারতের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান ভারতরত্নে ভূষিত হন। মৃত্যুর পর তার সম্মানে কলকাতার উপনগরী সল্টলেকের নামকরণ করা হয় বিধাননগর। তার জন্ম ও মৃত্যুদিন ১ জুলাই দিনটি সারা ভারতে 'চিকিৎসক দিবস' রূপে পালিত হয়।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় (জানুয়ারি ১৬, ১৯৩১-জুন ১৯, ১৯৮১) : একজন ভারতীয় চিকিৎসক ছিলেন, যিনি ভারতে প্রথম এবং পৃথিবীর দ্বিতীয় নল-জাত শিশু দুর্গার সৃষ্টিকর্তা হিসেবে স্বীকৃত।দুর্ভাগ্যজনক ভাবে আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের নিকট তার গবেষণার ফল জানানোর ক্ষেত্রে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দ্বারা প্রচণ্ড ভাবে বাধাপ্রাপ্ত হন এবং হতাশ হয়ে ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দের ১৯শে জুন আত্মহত্যা করতে বাধ্য হন। তার জীবন ও মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে তপন সিংহ এক ডক্টর কি মউত নামক হিন্দি চলচ্চিত্রটি পরিচালনা করেন।

তিনি ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে কলিকাতা জাতীয় আয়ুর্বিজ্ঞান বিদ্যামন্দির থেকে এমবিবিএস পাশ করেন এবং ধাত্রীবিদ্যায় প্রথম স্থান অর্জন করেন। তিনি ঐ বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শারীরবিদ্যা বিষয়ে বিএসসি ডিগ্রী অর্জন করেন এবং ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক সচ্চিদানন্দ ব্যানার্জীর অধীনে প্রজনন শারীরবিদ্যা বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইংল্যান্ড যান এবং ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধ্যাপক জন লোরেনের সঙ্গে গবেষণা করে লিউটিনাইজিং হরমোনের পরিমাপ নির্ণয়ের এক নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করে দ্বিতীয়বার পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন।

১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দের ৩রা অক্টোবর তিনি ভারতের প্রথম চিকিৎসক ও বিজ্ঞানী হিসেবে এক নল-জাত শিশুর জন্ম দিয়ে ইতিহাস স্থাপন করেন। তিনি এই শিশুটির নাম রাখেন দুর্গা (কানুপ্রিয়া আগরওয়াল)। ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক প্যাট্রিক স্টেপটো ও রবার্ট জিওফ্রি এডওয়ার্ডস দ্বারা ওল্ডহ্যাম জেনারেল হসপিটালে পৃথিবীর প্রথম নল-জাত শিশু লুইস জন ব্রাউনের জন্ম দেওয়ার ৬৭ দিন পরে সুভাষের গবেষণার দ্বারা দুর্গার জন্ম হয়।

কিন্তু আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে তার গবেষণার সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে চাইলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাকে বিদেশ যাওয়ার অনুমতি দিতে অস্বীকার করে। এই গবেষণার স্বীকৃতি প্রদান না করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্যদপ্তর তার গবেষণার সত্যতা সম্বন্ধেই সন্দেহ প্রকাশ করে ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ই নভেম্বর পাঁচ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। সুভাষের সমস্ত গবেষণা মিথ্যা বলে এই কমিটি রায় দেয়। শাস্তি স্বরূপ সুভাষকে রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অব অপথ্যালমোলজি নামক প্রতিষ্ঠানের চক্ষু বিভাগে স্থানান্তরিত করে দেওয়া হয়, যার ফলে প্রজনন শারীরবিদ্যা সমন্ধে সমস্ত গবেষণা তাকে বন্ধ করে দিতে হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আমলাতান্ত্রিকতা ও পশ্চিমবঙ্গের চিকিৎসক সমাজ দ্বারা ক্রমাগত বিদ্রুপ ও অপমানে হতাশ হয়ে সুভাষ ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দের ১৯শে জুন কলকাতায় নিজের বাসভবনে আত্মহত্যা করেন।

টি. সি. আনন্দ কুমারের গবেষণার ফলে ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট হর্ষবর্ধন রেড্ডি বুরি জন্মগ্রহণ করলে তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম নলজাত শিশু বলে গণ্য করা হয়। ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে আনন্দ কুমার কলকাতা শহরে অনুষ্ঠিত একটি বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে যোগ দিতে এলে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গবেষণা নথিগুলি তার হাতে আসে। এই সমস্ত নথিগুলি যাচাই করে ও দুউরগার পিতা-মাতার সাথে আলোচনা করে তিনি নিশ্চিত হন যে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ই ছিলেন প্রথম নল-জাত শিশুর স্রষ্টা।[৯] পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরকে পাঠানো গবেষণা সংক্রান্ত সুভাষের চিঠির কথা তিনি সংবাদমাধ্যমে প্রচার করেন।[৯] কানুপ্রিয়া আগরওয়ালা বা দুর্গা তার ২৫ তম জন্মদিনে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এক স্মৃতিসভায় নিজের পরিচয় সর্বসমক্ষে জানিয়ে ঘোষণা করেন যে, সুভাষের গবেষণা মিথ্যে ছিল না।

আনন্দীবাঈ গোপালরাও জোশী (জন্ম ৩১ মার্চ, ১৮৬৫-মৃত্যু ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৭) : ভারতের প্রথম নারী চিকিৎসক। তিনি ছিলেন প্রথম হিন্দু নারী, যিনি চিকিৎসাশাস্ত্রে শিক্ষার্জনের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যাত্রা করেন।

আনন্দীবাই ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দের ৩১ শে মার্চ ব্রিটিশ ভারতের থানে জেলার অন্তর্গত কল্যাণ গ্রামের এক রক্ষণশীল সমৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম গণপতরাও অম্বুতেশ্বর জোশী। শৈশবে তার নাম ছিল যমুনা। ১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে মাত্র নয় বছর বয়সে ঊনত্রিশ বছর বয়স্ক বিপত্নীক ডাকবিভাগে কর্মরত গোপালরাও বিনায়ক জোশীর সাথে তার বিবাহ দেওয়া হয়। বিয়ের পর তার নাম রাখা হয় আনন্দী। কোলাপুরে থাকাকালীন তিনি একটি সন্তানের জন্ম দিলেও উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে তার মৃত্যু হয়। গোপালরাও একজন নারী শিক্ষার সমর্থক প্রগতিশীল ব্যক্তি ছিলেন, যা তৎকালীন যুগে ভারতীয় রক্ষণশীল সমাজে খুব একটা সুলভ ব্যাপার ছিল না। গোপাল হরি দেশমুখের শত পত্রে নামক রচনা দ্বারা প্রভাবিত গোপালরাও সংস্কৃত অপেক্ষা ইংরেজি শিক্ষার দিকে বেশি মনোযোগী হন। স্বামীর তত্ত্বাবধানে আনন্দীর শিক্ষালাভ শুরু হয়। কোলাপুরে আনন্দী কিছুদিনের জন্য মিশনারি স্কুলে ভর্তি হলেও সামাজিক বাধায় স্কুল ছাড়তে বাধ্য হন। চৌদ্দ বছর বয়সে আনন্দী এক পুত্রসন্তানের জন্ম দেন, কিন্তু মাত্র দশ দিনের মধ্যে তার মৃত্যু হয়। এই ঘটনার ফলে আনন্দীর মধ্যে চিকিৎসাশাস্ত্র পাঠের ব্যাপারে আগ্রহের সৃষ্টি হয়।

তাদের সন্তানের মৃত্যু হলে গোপাল বিদেশের সংবাদপত্রে তার স্ত্রীর চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য আবেদন শুরু করেন। প্রায় দুই বছর পরে ১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই জুন রেভারেন্ড ওয়াইল্ডারকে লেখা তার চিঠি ক্রিশ্চিয়ান রিভিউ পত্রিকায় ছাপা হলে থিওডোরা কার্পেন্টার নামে এক মার্কিন মহিলার নজরে আসে। শিক্ষালাভের ব্যাপারে আনন্দীর আগ্রহ এবং স্ত্রীকে গোপালরাওয়ের উৎসাহ তাকে মুগ্ধ করে। থিওডোরা পত্রে আনন্দীবাঈকে আমেরিকায় শিক্ষালাভের ব্যাপারে সব রকম সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেন। কলকাতা শহরে থাকার সময় আনন্দীবাঈয়ের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। থিওডোরা তাকে আমেরিকা থেকে ঔষধ প্রেরণের ব্যবস্থা করলেও তা খুব একটা ফলপ্রদ হয়নি। ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে গোপালরাও কার্যসূত্রে শ্রীরামপুর শহরে বদলি হলে তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য আনন্দীবাঈকে একা আমেরিকা পাঠিয়ে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের ব্যাপারে রাজি করান। থরবর্ন নামক এক চিকিৎসক দম্পতি তাকে উইমেন'স মেডিক্যাল কলেজ অব পেনসিলভেনিয়াতে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দেন। তৎকালীন রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ আনন্দীর বিদেশযাত্রার বিরোধিতা করে। খ্রিস্টধর্মাবলম্বীরা তার সিদ্ধান্তের পক্ষে থাকলেও আনন্দীকে তারা ধর্মান্তরিত করতে উৎসাহী ছিলেন। আনন্দীবাঈ শ্রীরামপুর কলেজে একটি সভায় তার আমেরিকা যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে ভারতে একজন হিন্দু মহিলা চিকিৎসকের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। তিনি এই সভায় খ্রিস্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত না হওয়ার শপথও নেন। তিনি ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিল চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য কলকাতা থেকে নিউ ইয়র্ক শহরের উদ্দেশ্যে রওনা হন।

১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে আনন্দী নিউ ইয়র্ক পৌঁছন। সেখানে থিওডোরার সাহায্যে তিনি উইমেন'স মেডিক্যাল কলেজ অব পেনসিলভেনিয়াতে ভর্তি হন এবং ঐ কলেজের অধ্যক্ষা র‍্যাচেল বডলের সাহায্যে একটি বৃত্তি পেয়ে যান। আমেরিকায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে থেকে, শীতের প্রকোপে ও অপুষ্টিতে কঠিন পরিশ্রম করে আনন্দী যক্ষ্মা রোগের কবলে পড়েন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই মার্চ আনন্দীবাঈ চিকিৎসাবিজ্ঞানে স্নাতক লাভ করেন।

১৮৮৫ সালের ১০ অক্টোবর মেডিকেল কলেজে অধ্যায়নের সময় অনুষদ ডিনের অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে গৃহীত স্থিরচিত্রটি আনন্দীবাইয়ের একটি প্রচলিত ঐতিহাসিক ছবি। এছবিতে তাকে কেই ওকামি ও সাবাত ইসলামবুলির সাথে নিজ অঞ্চলের সংস্কৃতি অনুযায়ী উপস্থাপিত পোশাকে দেখা যায়। চিত্রের প্রত্যেক নারী-আনন্দী ভারতের, কেই জাপানের এবং সাবাত সিরিয়ার তথা নিজ দেশের প্রথম নারী যারা পাশ্চাত্যের বিদ্যালয় হতে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে স্নাতক অর্জন করে চিকিৎসক হয়েছিলেন।

ডিগ্রী লাভের পর কোলাপুর রাজ্যের কিং অ্যালবার্ট এডওয়ার্ড হাসপাতালে যোগ দেবার জন্য আমন্ত্রণ পেলে তিনি দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার পরে অসুস্থ অবস্থায় ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ই নভেম্বর বোম্বাই ফিরে এসে হাসপাতালে কাজে যোগদান করেন। কাজে যোগদান করার কিছু দিনের মধ্যেই আনন্দী পুনরায় অসুস্থ হয়ে কিং অ্যালবার্ট এডওয়ার্ড হাসপাতালে ভর্তি হলেন। কিন্তু কালাপানি পেরিয়ে আসা জাতিচ্যুত আনন্দীকে তার সহকর্মী এবং অন্যন্য চিকিৎসকেরা চিকিৎসা করতে অস্বীকার করেন। বিনা চিকিৎসায় ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ শে ফেব্রুয়ারি রাত দশটায় আনন্দীবাঈয়ের মৃত্যু হয়। তার ভস্মাবশেষ থিওদোরার নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হয়, যা তিনি তার পারিবারিক সমাধিতে স্থাপন করেন।

কাদম্বিনী গাঙ্গুলী (১৮ জুলাই, ১৮৬১-৩ অক্টোবর, ১৯২৩) : ব্রিটিশ ভারতের প্রথম দুই জন নারী স্নাতকের একজন এবং ইউরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে শিক্ষিত দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম নারী চিকিৎসক। উনিশ শতকের

শেষভাগে তিনি পাশ্চাত্য চিকিৎসায় ডিগ্রি অর্জন করেন এবং আনন্দীবাঈ জোশীর সাথে তিনিও হয়ে ওঠেন ভারতের প্রথমদিককার একজন নারী চিকিৎসক।

ব্রাহ্ম সংস্কারক ব্রজকিশোর বসুর কন্যা কাদম্বিনীর জন্ম হয় ১৮ই জুলাই ১৮৬১-তে বিহারের ভাগলপুরে। তার মূল বাড়ি ছিলো বর্তমান বাংলাদেশের বরিশালের চাঁদশীতে। তার বাবা ভাগলপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ব্রজকিশোর বসু অভয়চরণ মল্লিকের সাথে ভাগলপুরে মহিলাদের অধিকারের আন্দোলন করেছিলেন। তারা মহিলাদের সংগঠন ভাগলপুর মহিলা সমিতি স্থাপন করেছিলেন ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে। এই ঘটনা ছিল ভারতে প্রথম। দ্বারকানাথ ও তার বন্ধু কাদম্বিনীর পিসতুতো দাদা মনমোহনের হাত ধরে কাদম্বিনী তার পড়াশোনা আরম্ভ করেন হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ে। এক কালে দ্বারকানাথের পোলিও আক্রান্ত ছেলে সতীশের জ্বরের সময়ে তার মাথা ধুইয়ে তার প্রাণরক্ষা করেছিলেন কাদম্বিনী। এর জন্য তার বুদ্ধিমত্তার প্রশংসাও করেছিলেন তৎকালীন বিখ্যাত ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার। স্কুলজীবনে পড়াশুনা ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহ ছিল কাদম্বিনীর। স্কুলে পড়ার সময়ে তিনি ১৮৭৮ সালে প্রথম মহিলা হিসাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণিতে পাস করেন। তার দ্বারাই প্রভাবিত হয়ে বেথুন কলেজ প্রথম এফ.এ (ফার্স আর্টস) এবং তারপর অন্যান্য স্নাতক শ্রেণি আরম্ভ করে। কাদম্বিনী এবং চন্দ্রমুখী বসু বেথুন কলেজের প্রথম গ্র্যাজুয়েট হয়েছিলেন ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে। তারা বি.এ পাস করেছিলেন।তারা ছিলেন ভারতে এবং সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট।

গ্র্যাজুয়েট হবার পর কাদম্বিনী দেবী সিদ্ধান্ত নেন যে তিনি ডাক্তারি পড়বেন। ১৮৮৩ সালে মেডিকেল কলেজে ঢোকার পরেই তিনি তার শিক্ষক দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীকে বিয়ে করেন। দ্বারকানাথ বিখ্যাত সমাজসংস্কারক ও মানবদরদী সাংবাদিক হিসেবে খ্যাত ছিলেন। যখন তিনি বিয়ে করে তখন ৩৯ বছর বয়েসের বিপত্নীক, কাদম্বিনীর বয়স তখন ছিল একুশ। কাদম্বিনী ফাইন্যাল পরীক্ষায় সমস্ত লিখিত বিষয়ে পাস করলেও প্র্যাকটিক্যালে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অকৃতকার্য হন। ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে তাকে জিবিএমসি (গ্র্যাজুয়েট অফ বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজ) ডিগ্রি দেওয়া হয়। তিনি ছিলেন প্রথম ভারতীয় মহিলা যিনি পাশ্চাত্য চিকিৎসারীতিতে চিকিৎসা করবার অনুমতি পান। মেডিক্যাল কলেজে পড়াকালীন তিনি সরকারের স্কলারশিপ পান যা ছিল মাসে ২০ টাকা।

তিনি পাঁচ বছর মেডিক্যাল কলেজে পড়াশোনা করার পর বিলেত যাবার আগে ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কিছুদিন লেডি ডাফরিন মহিলা হাসপাতালে মাসিক ৩০০ টাকা বেতনে কাজ করেছিলেন। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে রাজমাতার চিকিৎসার্থে নেপাল যান। ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে বোম্বে শহরে কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশনে প্রথম যে ছয় জন নারী প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন কাদম্বিনী ছিলেন তাদের অন্যতম একজন। পরের বছর তিনি কলকাতার কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন। কাদম্বিনী ছিলেন কংগ্রেসের প্রথম মহিলা বক্তা। কাদম্বিনী গান্ধীজীর সহকর্মী হেনরি পোলক প্রতিষ্ঠিত ট্রানসভাল ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম সভাপতি এবং ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় অনুষ্ঠিত মহিলা সম্মেলনের সদস্য ছিলেন। ১৯১৪ সালে তিনি কলকাতায় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অধিবেশনে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এই অধিবেশন মহাত্মা গান্ধীর সম্মানের জন্য আয়োজন করা হয়েছিল। কাদম্বিনী চা বাগানের শ্রমিকদের শোষণের বিষয়ে অবগত ছিলেন এবং তিনি তার স্বামীর দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করেন যিনি আসামের চা বাগানের শ্রমিকদের কাজে লাগানোর পদ্ধতির নিন্দা

করেছিলেন। কবি কামিনী রায়ের সাথে কাদম্বিনী দেবী ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে বিহার এবং ওড়িশার নারীশ্রমিকদের অবস্থা তদন্তের জন্য সরকার দ্বারা নিযুক্ত হয়েছিলেন।

তিনি হিন্দু রক্ষণশীল সমাজের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন। ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে রক্ষণশীল বাংলা পত্রিকা বঙ্গবাসী তাকে পরোক্ষ ভাবে খারাপ ভাষায় সম্বোধন করেছিল। কাদম্বিনী এর বিরুদ্ধে মামলা করে জেতেন। বঙ্গবাসী পত্রিকার সম্পাদক মহেশ চন্দ্র পালকে ১০০ টাকা জরিমানা এবং ছয় মাসের জেল দেওয়া হয়।

আট সন্তানের মা হওয়ার কারণে সংসারের জন্যও তাকে বেশ সময় দিতে হতো। তিনি সূচিশিল্পেও নিপুণা ছিলেন। বিখ্যাত আমেরিকান ইতিহাসবিদ ডেভিড কফ লিখেছেন, 'গাঙ্গুলির স্ত্রী কাদম্বিনী ছিলেন তার সময়ের সবচেয়ে সফল এবং স্বাধীন ব্রাহ্ম নারী। তৎকালীন বাঙালি সমাজের অন্যান্য ব্রাহ্ম এবং খ্রিস্টান নারীদের চেয়েও তিনি অগ্রবর্তী ছিলেন। সকল বাধার ঊর্ধ্বে উঠে মানুষ হিসেবে নিজেকে জানার তার এই ক্ষমতা তাঁকে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে নারীর অধিকার নিয়ে কথা বলা জনগোষ্ঠীর কাছে অনুপ্রেরণার উৎসে পরিণত করে।'

১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দের ৩রা অক্টোবর কাদম্বিনী বসু গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি অপারেশন সেরে বাড়ি ফেরার পথে হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু হয়।

হৈমবতী সেন (১৮৬৬—৫ আগস্ট ১৯৩৩) : (বিবাহের পূর্বে হৈমবতী বা হেমবতী ঘোষ), ছিলেন একজন ভারতীয় মহিলা চিকিৎসক যিনি বাল্যবিধবা হয়ে কেবল আত্মবিশ্বাসে ভর করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হন।

হৈমবতী ঘোষের জন্ম ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ ভারতের অধুনা বাংলাদেশের খুলনা জেলার নৈহাটি ইউনিয়নের শ্রীরামপুর নৈহাটির এক কুলীন কায়স্থ বংশে। পিতা প্রসন্নকুমার ঘোষ ছিলেন জমিদার। পিতামহ শিবনাথ ঘোষ (১৮০৯-১৮৪৯) নীলকুঠি সাহেব রেনির বিরোধিতা করে বাংলার বাহাদুর আখ্যা লাভ করেছিলেন। দাদা ও ভাইদের পড়াশোনা দেখে হৈমবতীর পড়াশোনার ইচ্ছা হত। কিন্তু তখনকার পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নির্মমতায় কিছুদিন বিদ্যালয়ের পাঠের পরই অসহায় পিতা মাত্র সাড়ে নয় বৎসর বয়সে বিবাহ দেন বছর পঁয়তাল্লিশের এক বিপত্নীক পাত্রের সঙ্গে।৩৩ কিন্তু বিবাহের অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই হৈমবতী বিধবা হন। বালবিধবা হয়ে শ্বশুরবাড়ি, বাপের বাড়িসহ পরিবারের লোকজনের কাছ থেকে কোনো সাহায্য না পেয়ে নিঃসম্বল ও নিরুপায় অবস্থায় যুবতী হৈমবতী কাশীবাসী হন। সেখানে বালিকা বিদ্যালয়ে পড়িয়ে গ্রাসচ্ছাদনের ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হতে না পেরে পড়াশোনার ইচ্ছায় কলকাতা আসেন। ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে সাহায্য প্রার্থনায় তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচারক কুঞ্জবিহারী সেনকে বিবাহের শর্তে লেখাপড়ার অনুমতি পান। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের তাদের বিবাহ হয়। কলকাতার ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলের এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পান। স্কুলের সেরা ছাত্রী হিসাবে বিশেষ পারদর্শিতার জন্য বৃত্তিসহ পাঁচটি পদক লাভ করেন। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে ক্লাসে শীর্ষ স্থান অধিকার করে ভার্নাকুলার লাইসেনশিয়েটেড ইন মেডিসিন অ্যান্ড সার্জারি ডিপ্লোমা লাভ করেন। তার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি না থাকায় এল. এম. এস. এর সমস্ত পাঠক্রম শেষ করেও তিনি এল এম এস ডিপ্লোমা পান নি।

হৈমবতী ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দ হতেই তিনি চল্লিশ টাকা বেতনে হুগলির চুঁচুড়ায় লেডি ডাফরিন মহিলা হাসপাতালে যুক্ত হন। এল এম এস ডিপ্লোমা না পাওয়ার কারণে হসপিটাল অ্যাসিস্ট্যান্ট-এর বেশি উচ্চ

পদে চাকরি করতে পারেন নি। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করার সময় তাকে শিক্ষনপ্রাপ্ত 'দাই' বলে গণ্য করা হত। পদের নাম হসপিটাল অ্যাসিস্ট্যান্ট হলেও তার কর্মদক্ষতায় দুবছর পর বেতন হয় পঞ্চাশ টাকা এবং তাকে লেডি ডাক্তার বা চুনিবাবু বলেই উল্লেখ করা হত। ওই একই বেতনে তিনি দীর্ঘ ষোল বৎসর সেখানে কাজ করেন। চিকিৎসা পদ্ধতির গুণে এবং রোগীদের প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাবের কারণে তিনি বিশেষ জনপ্রিয় ডাক্তার দিদি হয়েছিলেন।

বঞ্চিত ভারতীয় নারীর অবস্থান থেকে তিনি এক সফল কর্মজীবন গড়ে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। পর্দাপ্রথা সম্পর্কে গোঁড়া না হয়েও, অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থাগ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন তিনি।

হৈমবতী নিজেকে শুধুমাত্র চিকিৎসকের গণ্ডিতে বেঁধে রাখেননি। তিনি পরিবারের দেখাশোনার সঙ্গে সাহিত্যচর্চাও করেছেন। কবিতা, ছোট গল্প ছাড়াও তিনি একান্ত ঘরোয়া বাংলায় আত্মজীবনী স্মৃতিকথা রচনা করেন। প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'ডাঃ হৈমবতী সেন-এর জীবনকথা' নামে ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এছাড়া মেমোরিজ অফ ডক্টর হৈমবতী সেন ফ্রম চাইল্ড উইডো টু লেডি ডক্টর নামে ইংরাজীতে অনূদিত হয় ২০০০ খ্রিস্টাব্দে। কানাডার নারীবাদী লেখিকা জেরাল্ডিন ফোর্বস ২০২০ খ্রিস্টাব্দে তপন রায়চৌধুরীর সঙ্গে তার জীবনীর প্রেক্ষাপটে যুগ্মভাবে লেখেন-দ্য মেমোরসঅফ ড. হৈমবতী সেন।

সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১) Write a short note about Dr Madhusudan Gupta.

২) What was the importance of Women in medical profession?

৩) Discuss the role of prominent medical professionals with special reference to Radha gobinda Kar and Nilratan Sarkar.

পর্যায়-৬

একক-১৫

বিন্যাসক্রম

৪০৩.৪.৬.১৫ উদ্দেশ্য

৪০৩.১.২ 1

৪০৩.১.৩ ১

৪০৩.৪.৬.১৫ Health for all-People's Health Movement

সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের আলমা-আটায় ১৯৭৮ সালে যে সম্মেলন হয়েছিল সেখানে সবার জন্য স্বাস্থ্যের দাবি কিন্তু সাবেক হয়ে যায়নি। সম্মেলনের চল্লিশ বছর পরে, আজকেও তা খুবই প্রাসঙ্গিক। এই দাবির মূল কথা ছিল ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য। কিন্তু ৩৩ বছর তো বটেই, তার পরেও ৭ বছর কেটে গিয়েছে; কেউ কথা রাখেনি। এ কথা মনে করিয়ে দেওয়ার লোকের অভাব ছিল, এমনও বলা যায় না। বিশ্বজনীন এই দাবির জাতীয় এবং আঞ্চলিক দিকও লক্ষ্য করা যায়, যেমন ১৯৭৮-এর পর আমাদের রাজ্যে স্বাস্থ্যের অধিকার নিয়ে আন্দোলনের ইতিহাস নেহাত ফেলনা নয়। ১৯৭৮-এর সম্মেলনে যে সবার জন্য স্বাস্থ্যের কথা বলা হয়েছিল তাতে একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল, যে স্বাস্থ্য মানুষের অধিকার সেই অধিকার অর্জনের জন্য লড়াই দরকার। লড়াইটা রাজনৈতিক এবং সামাজিকও। আন্তর্জাতিক মঞ্চে এই লড়াইটা দেখা যায় ২০০০ সালে। সবার জন্য স্বাস্থ্যের দাবিতে এই বছর বিভিন্ন দেশের গণস্বাস্থ্য কর্মী, অ-সরকারি সংস্থা, নারী সংগঠন এক ছাতার নীচে জড়ো হয়ে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিল। তারা তাদের লড়াইয়ের নাম দিল 'জনস্বাস্থ্য আন্দোলন' ('People's Health Movement')।

আজ থেকে ২৯ বছর আগে ১৯৮৩-তে পশ্চিমবাংলার জুনিয়র ডাক্তাররা স্লোগান তুলেছিল—'স্বাস্থ্য কোন ভিক্ষা নয় স্বাস্থ্য আমাদের অধিকার'। আমাদের দেশে স্বাস্থ্যের অধিকার অধিকার হিসেবে স্বীকৃত নয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা-র সংজ্ঞা অনুযায়ী 'স্বাস্থ্য কেবল অসুস্থতার অনুপস্থিতি নয় স্বাস্থ্য মানে শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ভাবে বালো থাকা'।

আমাদের দেশে ঋণ নেওয়ার দ্বিতীয় অন্যতম কারণ চিকিৎসার খরচ। হাসপাতালে ভর্তির খরচ মেটাতে প্রতি বছর প্রায় এক কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে নেমে যান। হাসপাতালে যাঁরা ভর্তি হন, তাঁদের এক-তৃতীয়াংশকে ভর্তির খরচ মেটাতে হয় ধার করতে হয় নয়তো সম্পত্তি বিক্রি করতে হয়। অথচ খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের মতই প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা। জমির অধিকার, জলের অধিকার, কর্ম-সংস্থানের অধিকারের মত স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা পরিষেবার অধিকারও জীবনের বিষয়, কখনও কখনও বাঁচা-মরার প্রশ্ন। কিন্তু বাকী বিষয়গুলোর মত চিকিৎসা পরিষেবার অপ্রতুলতা সব সময় মানুষকে প্রভাবিত করে না। কারণ

বেঁচে থাকার জন্য প্রতিদিন খাদ্য-জল-বাসস্থান দরকার, চিকিৎসার দরকার হয় না সব সময়। কিন্তু চিকিৎসার অপ্রতুলতায় মানুষ যখন প্রভাবিত হন তখন তাঁর ক্ষোভ চিকিৎসক-চিকিৎসাকর্মী-চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের ওপর ফেটে পড়ে, অনেক সময় অন্যায্য ভাবেও।

চিকিৎসা পরিষেবায় বেসরকারীকরণ যে সব দেশে বেশী, সেগুলোর মধ্যে অন্যতম আমাদের দেশ। বেসরকারী চিকিৎসা পরিষেবা ক্ষেত্রের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ নেই বললেই চলে। শহর ও গ্রামের মধ্যে পরিষেবায় বিপুল ফারাক। চিকিৎসা পরিষেবার পরিমাণ ও গুণমান—দুই-ই অপর্যাপ্ত। দেশবাসীর দুর্দশা কমাতে মহানুভব ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ নিঃশুল্ক ডাক্তারখানা বা হাসপাতাল খুলেছেন, কোন রাজনৈতিক দল বা অ-রাজনৈতিক সংগঠন বন্যা-খরা-মহামারীর সময় চিকিৎসা ত্রাণ চালিয়েছেন—এমনটা দেখা গেলেও স্বাস্থ্যের দাবী নিয়ে আন্দোলনের ইতিহাস বেশী দিনের নয়, বছর ৩০-৩৫ এ ধরনের আন্দোলনের বয়স। বামপন্থী দলগুলোও স্বাস্থ্যের বিষয়গুলোকে আন্দোলনের বিষয় হিসেবে নিয়েছেন এমনটা নয়—অথচ বহু ডাক্তার বামপন্থী দলগুলোর সদস্য বা সমর্থক হিসেবে ছিলেন বা আছেন। তাঁদের কাছ থেকে উচ্চ হারে লেভি নেওয়া, তাঁদের দিয়ে সংগঠনের সদস্য-সমর্থকদের বিনামূল্যে চিকিৎসা করানো, কখনও সখনও তাঁদের দিয়ে আন্দোলনের সময় বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় চিকিৎসা শিবির চালানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছে দলগুলো। তাঁদের স্বাস্থ্য আন্দোলনের সংগঠক হিসেবে ব্যবহার করা হয়নি বললেই চলে। স্বাস্থ্য ভিক্ষা নয়, অধিকার—সেই অধিকার অর্জনের জন্য সংগ্রাম করতে হবে—এই ধারণা থেকে আন্দোলন সংগঠিত হতে থাকে ৭০ দশকের মাঝামাঝি, ৮০-র দশকের শুরু থেকে। ভারতের নানা কোণে চলা এইসব আন্দোলনগুলো নিয়ে এই আলোচনা—উদ্দেশ্য আন্দোলনগুলোর ইতিহাস-নেতিবাচক দিকগুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে 'সবার জন্য স্বাস্থ্য'-এর লক্ষ্যে এগিয়ে চলা। জনস্বাস্থ্য আন্দোলন মানুষের স্বাস্থ্যের অবস্থার উন্নয়নকল্পে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগানোর পক্ষে, কিন্তু জনস্বাস্থ্য আন্দোলন সাধারণভাবে মনে করে। কেবল প্রযুক্তি দিয়ে সামাজিক সমস্যাগুলোর সমাধান করা যায় না। বিশেষজ্ঞ (এই ক্ষেত্রে চিকিৎসক, চিকিৎসাকর্মী বা স্বাস্থ্যকর্মী) জনগমের হয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। জনগণ চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠানের ব্যবহার্য বস্তু নন, বরং জনগণেরই চিকিৎসা-পরিষেবার নির্ণায়ক শক্তি হওয়ার কথা। ভারতে এ যাবৎ চলে আসা স্বাস্থ্য আন্দোলনগুলোকে যদি আমরা পর্যালোচনা করি, তাহলে কয়েকটা সুস্পষ্ট ধারা দেখা যায়—

(a) গণবিজ্ঞান আন্দোলনের স্বাস্থ্য সচেতনতার প্রয়াস

(b) ওষুধনীতি নিয়ে প্রচার

(c) নারীবাদী আন্দোলনের স্বাস্থ্য প্রচার

(d) ভূপালের গ্যাসপীড়িতদের আন্দোলন

(e) ডাক্তারদের সংগঠন

(f) মেডিকেল ছাত্র ও জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলন

(g) পেশাগত রোগ নিয়ে প্রচার ও আক্রান্তদের চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণের দাবীতে আন্দোলন

(h) জনস্বাস্থ্য অভিযান পত্র-পত্রিকা ও গণসংগঠনের নেতৃত্বে স্বাস্থ্য আন্দোলন।

৪০৩.৪.৬.১৫ গণবিজ্ঞান আন্দোলনের স্বাস্থ্য সচেতনতার প্রয়াস

গণবিজ্ঞানের পাশাপাশি জনস্বাস্থ্য সচেতনতার উল্লেখযোগ্য কাজ যে সংগঠনগুলো করেছে, তাদের মধ্যে আছে—কেরালার কেরালা শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদ, মূলত সিপিআইএম-প্রভাবিত। মহারাষ্ট্রের লোক বিদ্যান সংগঠন, শ্রমিক মুক্তি দল-প্রভাবিত। পশ্চিমবাংলায় তৃতীয় ধারার শক্তি পরিচালিত বিভিন্ন বিজ্ঞান সংগঠন, অনেক ক্ষেত্রে প্রকাশিত পত্রিকার নামে যাদের পরিচয়—উৎস মানুষ, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী ইত্যাদি। আইশর দশক ছিল এই সংগঠনগুলোর কাজের গৌরবোজ্জ্বল সময়। সে সময়ে এই সংগঠনগুলো মিলে গড়ে তোলে গণবিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ। পরবর্তীকালে সিপিআইএম-প্রভাবিত সরকারি মদতপুষ্ট পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ-এর সামনে এগুলো ক্ষীণবল হয়ে পড়ে।

ওষুধনীতি নিয়ে প্রচার ১৯৭৫-এ জয়শুকলাল হাথীর নেতৃত্বাধীন সংসদীয় কমিটি প্রকাশিত রিপোর্টে বলে ১১৭টা মাত্র ওষুধ ভারতের জন্য অত্যাবশ্যক। কমিটি এই ওষুধগুলোর উৎপাদন নিশ্চিত করার সুপারিশ করে, ওষুধের ব্রান্ড নাম বা বাজারী নামের বদলে জেনেরিক নাম বা বৈজ্ঞানিক নাম ব্যবহারের সুপারিশ করে। যাতে জীবনদায়ী ও অত্যাবশ্যক ওষুধগুলো মানুষের আয়ত্বের মধ্যে থাকে তাই মূল্য-নিয়ন্ত্রণের সুপারিশ করা হয়। হাতি কমিটি চেয়েছিল পাব্লিক সেক্টর যেন ওষুধ উৎপাদনে মুখ্য ভমিকা নেয়। দেশীয় ওষুধ কোম্পানীগুলোর জন্য সংরক্ষিত রাখার কথা বলা হয়। ওষুধ-শিল্পে বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর ভূমিকার নিন্দা করে কমিটি, ওষুধ-কোম্পানীগুলোর জাতীয়করণের পক্ষে ছিল হাতি কমিটি। আশির দশকের শুরুতে প্রতিবেশী বাংলাদেশের সামরিক স্বৈর সরকার এক জনমুখী পদক্ষেপ নেয়, বাংলাদেশের বাজার থেকে অপ্রয়োজনীয়, ক্ষতিকর সব ওষুধ নিষিদ্ধ করে। প্রায় একই সময়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অত্যাবশ্যক ওষুধের প্রথম তালিকা প্রকাশ করে, সে তালিকায় ওষুধ ছিল শ'দুয়েক। এই ওষুধগুলো দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের প্রায় সমস্ত রোগ চিকিৎসা সম্ভব। অত্যাবশ্যক ওষুধের তালিকা ছিল ১৯৭৭-এ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা-ঘোষিত' ২০০০ সালের মধ্যে সবার জনস্বাস্থ্য'-এর লক্ষ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। অথচ ভারতের বাজারে তখন হাজার ষাটেক ওষুধের ফরমুলেশন। জনমুখী জাতীয় ওষুধনীতির দাবীতে গড়ে ওঠে অল ইন্ডিয়া ড্রাগ কেশন নেটওয়ার্ক (AIDAN)। নানা রাজ্যে AIDAN-এর শাখা সংগঠনগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল ড্রাগ একশন ফোরাম, পশ্চিমবঙ্গ (DAF-WB)। ড্রাগ একশন ফোরাম স্লোগান তোলে 'মানুষের জন্য ওষুধ না ওষুধের জন্য মানুষ'। একই নামে ফোরামের এক পুস্তিকা প্রচুর জনপ্রিয় হয়। পুস্তিকাটার হিন্দী অনুবাদও করা হয়, পার্শ্ববর্তী রাজ্য বিহারে প্রচারের জন্য। ডাক্তারদের ওষুধের যুক্তিসঙ্গত ব্যবহারে শিক্ষিত করতে এক দ্বিমাসিক জার্নাল বার করা হতে থাকে—ড্রাগ ডিজিজ ডক্টর (DDD)। ৯০-এর দশকের মাঝামাঝি অবশ্য DAF দুর্বল হয়ে পড়ে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ব্যক্তিত্বের সংঘাতে।

ইস্ট্রোজেন-প্রোজেস্টেরন-এর উচ্চমাত্রায় মিশ্রণের বিরুদ্ধে জনস্বার্থ মামলা করে AIDAN। AIDAN-এর জনস্বার্থ মামলার চাপে সরকার ৭০টারও বেশি ক্ষতিকর ওষুধ নিষিদ্ধ করতে বাধ্য হয়। যুক্তিসঙ্গত জেনেরিক ওষুধ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কিছু উদ্যোগও শুরু হয়েছিল এই আন্দোলনের পাশাপাশি। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বরোদার LOCOST এবং কলকাতার কমিউনিসি ডেভেলপমেন্ট ইউনিট (CDMU) । LOCOST নিজস্ব কারখানায় জেনেরিক নামের কিছু অত্যাবশ্যক ওষুধ তৈরী করে। CDMU ওষুধ কোম্পানিগুলোর কাছে থকে দর কষাকষি করে ওষুধ কিনে কম দামে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোকে সরবরাহ

করে। AIDAN-এর প্রধান দুর্বলতা হল গণ আন্দোলনের সঙ্গে ওষুধনীতির আন্দোলনকে যুক্ত করার চেষ্টা না করে আদালতে মামলা আর সরকারী দপ্তরে আবেদন-নিবেদন নিজেকে সীমিত রাখা।

৪০৩.৪.৬.১৫ নারীবাদী আন্দোলনের স্বাস্থ্য প্রচার

হায়দরাবাদের স্ত্রীশক্তি সংগঠন, দিল্লীর সহেলীর মত নারীবাদী সংগঠনগুলো Depo-provera, NET-EN, Nor-plant-এর মত ক্ষতিকর জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলো বিরুদ্ধে জোরদার প্রচার চালিয়ে সরকারকে জাতীয় পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীতে এগুলো অন্তর্ভুক্ত করায় সফলভাবে বাধা দেয়। মহিলাদের জননস্বাস্থ্যের বিষয়গুলোকে ধোয়াশামুক্ত করার প্রয়াস, স্ত্রীভ্রূণ-হত্যার বিরুদ্ধে প্রচার এদের উল্লেখযোগ্য অন্য কাজ। এই সংগঠনগুলোর মূল দুর্বলতা হল—এরা ফাডিং এজেন্সির ফান্ড নিয়ে কাজ করে এবং এদের কাজ ছোট-ছোট এলাকায় সীমিত।

৪০৩.৪.৬.১৫ ভূপালের গ্যাসপীড়িতদের আন্দোলন

ভারতের স্বাস্থ্য আন্দোলনের ইতিহাসে আলাদাভাবে উল্লেখ্যের দাবী রাখে ভূপালের গ্যাসপীড়িতদের আন্দোলন। ২-৩ ডিসেম্বর, ১৯৮৪-তে ইউনিয়ন কার্বাইডের গ্যাস কাণ্ডের পর গ্যাসপীড়িতরা যে আন্দোলন শুরু করেন তাতে ছিল তথ্যের অধিকারের দাবী—বিষগ্যাসে কি কি উপাদান ছিল, মানব ও মানবেতর প্রাণীর শরীরে তাদের কিউবা প্রভাব, বিষের প্রতিষেধকই বা কি সে সম্বন্ধে গ্যাসপীড়িতরা আনতে চান। আর ছিল যথাযথ চিকিৎসা, বিষের উচিত প্রতিষেধকের দাবী। গ্যাসপীড়িতদের যে সংগঠন এই আন্দোলন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিল তা হল জাহরিলী গ্যাস কাণ্ড সংঘর্ষ মোর্চা (ZGKSM)। এই সংগঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিলেন বিজ্ঞান শিক্ষা নিয়ে মধ্যপ্রদেশে কর্মরত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কয়েকজন কর্মী ও এসইউসিআই-এর কিছু সংগঠক। এছাড়া ছিল সিপিআই-প্রভাবিত নাগরিক রাহত আউর পুনর্বাস কমিটি (NRPC)। স্বাস্থ্য নিয়ে সমীক্ষার কাজ করে চিকিৎসকদের সংগঠন মেডিকো ফ্রেন্ডস সার্কেল (MFC) । ১৯৮৫-র ৩রা জুন গ্যাসপীড়িতরা ইউনিয়ন কার্বাইড প্রাঙ্গণকে মুক্তাঞ্চল ঘোষণা করে সেখানে এক ক্লিনিকের কাজ শুরু করেন। ZGKSM ও NRPC ছাড়া বম্বের ট্রেড ইউনিয়ন রিলিফ ফান্ড (TURF) ও ইউনিয়ন কার্বাইড কর্মচারী সংঘ (UCKS) যৌথভাবে জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র নামে এই ক্লিনিক চালাত। এই ক্লিনিকে ডাক্তার হিসেবে কাজ করতেন মূলত পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসা DAF-WB ও মেডিকেল কলেজ ডেমোক্র্যাটিক স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন (MCDSA)-এর সঙ্গে যুক্ত জুনিয়র ডাক্তাররা। তাঁরা গ্যাসপীড়িতদের বিষের প্রতিষেধক সোডিয়াম থায়োসালফেট ইঞ্জেকশন লাগাতেন এবং রোগীদের উপসর্গের পরিবর্তন নথিভুক্ত করতেন। ইউনিয়ন কার্বাইডের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যপ্রমাণ যোগাড় হচ্ছিল, তাতে সন্ত্রস্ত হয়ে ইউনিয়ন কার্বাইডের দোসর সরকার আক্রমণ নামিয়ে আনে সপ্তাহ তিনেকের মাথায়। ডাক্তার-স্বাস্থ্যকর্মীরা গ্রেপ্তার হন, স্বাস্থ্য কেন্দ্র বন্ধ হয়ে যায়। আবার মাস দেড়েক বাদে DAF, MFC, মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার, শহীদ হাসপাতালের সিনিয়র ডাক্তাররা পর্যায়ক্রমে জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র চালান কয়েক মাস। এর মাঝে ZGKSM-NRPC-র বিরোধে জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র ভেঙে তৈরী করতে হয় জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ভূপাল। এরপর ZGKSM এস ইউ সি আই-এর কুক্ষিগত হয়, স্বেচ্ছাসেবীদের মোর্চায় একঘরে করে দেওয়া হয়। শেষে ZGKSM ইউনিয়ন কার্বাইডের সঙ্গে

ভারত সরকারের অন্যায় চুক্তি সমর্থন করে গ্যাসপীড়িতদের আস্থা হারায়। গ্যাসপীড়িতদের নেতৃত্ব দিতে এবার এগিয়ে আসে গাসপীড়িত মহিলা উদ্যোগ সংগঠন। ZGKSM-এর সহযোগী বুদ্ধিজীবীদের একাংশ গঠন করেন ভূপাল গ্রুপ ফর ইনফরমেশন এন্ড একশন। পরে গঠিত হয় সম্বাভনা ট্রাস্ট।

সম্ভাবনা ট্রাস্ট এলোপ্যাথি, আয়ুর্বেদ, যোগের সমন্বয়ে গ্যাসপীড়িতদের চিকিৎসা ও চিকিৎসা-সংক্রান্ত গবেষণার কাজ চালাচ্ছে—তা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আমাদের অজানা। এছাড়া সম্ভাবনা ট্রাস্ট কোন ফান্ডিং এজেন্সির অর্থগ্রহণ না করলেও, প্রায় পূর্ণত দান (অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিদেশী বন্ধুদের দান)-এর ওপর নির্ভরশীল, এটাও এর দুর্বলতার দিক।

৪০৩.৪.৬.১৫ ডাক্তারদের সংগঠন—মেডিকো ফ্রেন্ডস সার্কেল

সত্তর দশকের প্রথমার্ধে জয়প্রকাশের আদর্শে অনুপ্রাণিত কিছু ডাক্তার এই সমন্বয় গড়ে তোলেন। বছরে দুবার অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক সভায় এরা স্বাস্থ্যনীতি-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। MFC Bulletin নামে এক বুলেটিনের মাধ্যমে মতামত আদান-প্রদান করেন। এঁদের উল্লেখযোগ্য কিছু প্রকাশনা—

1. Health Care : Which Way to Go?
2. In Search of Diagnosis
3. Under the Lense
4. Medical Education Re-examined

MFC-র উদ্যোগে ভূপালের গ্যাসপীড়িতদের স্বাস্থ্য-সমীক্ষা হয় ১৯৮৬ এবং ১৯৮৯-এ। গুজরাটের দাঙ্গা-পরবর্তী ত্রাণ-শিবিরগুলোতে এঁদের উদ্যোগে চিকিৎসা-ত্রাণের ব্যবস্থা করা হয়। MFC-র দুর্বলতার দিক হল প্রথম অবস্থায় এর সদস্যরা প্রায় সবাই গণ-সংগঠন গণ-আন্দোলনের কর্মী হলেও এখন তাঁরা প্রায় সবাই ফান্ডেড এন ডি ও-র কর্মী বা কর্মকর্তা। মেডিকেল ছাত্র ও জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলন।

- ✶ ১৯৭৩—হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ও ভাতা বৃদ্ধির দাবীতে মেডিকেল ছাত্র ও জুনিয়র ডাক্তাররা আন্দোলন করেন।
- ✶ ১৯৭৪—MFC-র বার্ষিক সভায় বাংলার মেডিকেল ছাত্ররা অংশ নেন।
- ✶ ১৯৭৪—সরকারী ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ারদের ৪১ দিন ব্যাপী ধর্মঘট হয় নীতি-নির্ধারণে আমলাদের বদলে প্রযুক্তিবিদদের গুরুত্ব দেওয়ার দাবীতে।
- ✶ ১৯৭৫—বাঁকুড়ায় খরা-ত্রাণে মেডিকেল ছাত্ররা।
- ✶ ইমার্জেন্সির কালো দিনগুলোতে নিজেদের সংঘবদ্ধ রাখা ও মেহনতী মানুষের পাশে থাকার জন্য মেডিকেল কলেজ সোশ্যাল সার্ভিস এসোসিয়েশন গঠন করা হয়, শিবপুরের চওড়া বস্তিতে সাপ্তাহিক শিবির চলে বেস কয়েকবছর।
- ✶ ১৯৭৯—অন্ধ্রের সাইক্লোন-পীড়িত, মরিচঝাঁপির উদ্‌বাস্তুদের পাশে মেডিকেল ছাত্ররা।
- ✶ ১৯৮০—মেডিকেল কলেজ ও আর. জি. করে হাসপাতাল আন্দোলন চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির দাবীতে।

✶ ১৯৮৩ ও ১৯৮৬-তে জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলন অল বেঙ্গল জুনিয়র ডাক্তার ফেডারেশন (ABJDF)-এর নেতৃত্বে, এই আন্দোলনের প্রধান দাবীগুলো ছিল—

1. 24 ঘণ্টা এক্স-রে ইসিজি, বায়োকেমিস্ট্রি, প্যাথোলজি, ব্লাড ব্যাংক
2. বেড সংখ্যাবৃদ্ধি
3. কর্মীসংখ্যা বৃদ্ধি
4. টেলি-যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন
5. জুনিয়র ডাক্তারদের প্রশিক্ষণান্তে কর্মসংস্থান
6. ভাতা বৃদ্ধি

এই আন্দোলনকে ভাঙ্গতে ABJDF ভেঙ্গে শাসক দলে পেটোয়া জুনিয়র ডক্টরস' কাউন্সিল গড়ে তোলা হয়, JDC-র সদস্যদের মেডিকেল কলেজগুলোতে বসিয়ে দেওয়া হয় আন্দোলন ভাঙ্গার দায়িত্ব দিয়ে। সরকারী ডাক্তারদের একমাত্র সংগঠন হেলথ সার্ভিস এসোসিয়েশন (HSA) ABJDG আন্দোলনকে সমর্থন করায় ট্রান্সফার-প্রোমোশনের লাঠি ও গাজর দেখিয়ে তৈরী করা হয় এসোসিয়েশন অফ হেলথ সার্ভিস ডক্টরস (AHSD)।

তাহলেও এ আন্দোলন ব্যর্থ হয় নি, সাময়িকভাবে হলেও সরকার সরকারী হাসপাতালে ওষুধ সরবরাহ বাড়াতে, পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুবিধা বাড়াতে বাধ্য হয়।

এছাড়া আরেকটা দিকও উল্লেখ করার মত—শহীদ হাসপাতাল, বেলুড় শ্রমজীবী হাসপাতাল, শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগের মত জনস্বাস্থ্য কর্মসূচীগুলোর সংগঠকের ভূমিকা যাঁরা পালন করছেন, তাঁরা প্রায় সবাই-ই ABJDG আন্দোলনের ফসল।

এই আন্দোলনই স্লোগান তুলেছিল—স্বাস্থ্য কোনও ভিক্ষা নয়, স্বাস্থ্য আমাদের অধিকার।

পেশাগত রোগ নিয়ে প্রচার ও আক্রান্তদের চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণের দাবীতে আন্দোলন ও প্রচার আন্দোলন।

✶ Occupational Health and Saftey Centre
✶ PRIA, নয়াদিল্লী
✶ খেড়ুত মজদুর সংঘ, মধ্যপ্রদেশ
✶ People's Training & Research Centre, গুজরাট
✶ OSHAJ, ঝাড়খণ্ড
✶ PRASAR, দিল্লী
✶ টপ কোয়ার্ক (বিজন ষড়ঙ্গী), ঝাড়গ্রাম, পশ্চিমবঙ্গ
✶ নাগরিক মঞ্চ, কলকাতা

এই সংগঠনগুলো পত্র-পত্রিকা বার করে জনসচেতনতা তৈরী করা, আদালতে মামলা করে ক্ষতিপূরণ আদায় করার মত কাজ করে।

৪০৩.৪.৬.১৫ জনস্বাস্থ্য অভিযান

১৯৭৭-এ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা '২০০০ সালের মধ্যে সকলের জন স্বাস্থ্য'-এর লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছিল। ২০০০-র সালের দোরগোড়ায় পৌঁছে যখন দেখা গেল সকলের জন্য স্বাস্থ্য তো দূরের কথা বরং সরকারী স্বাস্থ্য পরিষেবা দুর্বল থেকে দুর্বলতর হচ্ছে, চিকিৎসা ব্যবসায় বেসরকারী পুঁজির রমরমা বাড়ছে তখন ২০০০ সালে স্থাপিত হল জলস্বাস্থ্য অভিযান। এতে MFC-র সদস্য বেশ কিছুজন সংগঠক হিসেবে থাকলেও মূল রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে ছিল সিপিআইএম তার নানা গণ-সংগঠনের আড়ালে। (যেজন্য পশ্চিমবঙ্গে বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য আন্দোলনে কর্মরত অনেক সংগঠনের কোনটাই জনস্বাস্থ্য অভিযানে স্থান না পেয়ে কেবল স্থান পায় সরকারী গণ-বিজ্ঞান সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ।)

২০০০-এর ডিসেম্বরে যুবভারতীতে ২ দিনের পিপলস হেলথ এসেম্বলীতে সারা ভারতের প্রতিনিধিরা আলাপ-আলোচনা করেন। তারপর ঢাকায়। পরবর্তীকালে সরকারী স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এর দেশের বিভিন্ন জায়গায় সরকারী ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে জনশুনানীর আয়োজন করে।

জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন (NRHM)-এর ওপর নজরদারীকেও এরা কাজ হিসেবে নিয়েছে। NRHM-এর অন্তর্গত গ্রামীণ স্বাস্থ্যকর্মী প্রশিক্ষণের এক পাইলট প্রোজেক্ট ছত্তিশগড়ে চালান জনস্বাস্থ্য অভিযানের অন্যতম সংগঠক ডা: বিনায়ক সেন। সেই স্বাস্থ্যকর্মীরা মিতানিন নামে পরিচিত। জনস্বাস্থ্য অভিযানের অন্যান্য ঘটকরা অনেকে NRHM-এর গ্রামীণ মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী ASHA (Accrediated Social Health Activist) ট্রেনিং-এর কাজে লিপ্ত আছেন। জনস্বাস্থ্য অভিযান ব্যবস্থা পরিবর্তনের ঘোষিত লক্ষ্যে ব্যবস্থার সঙ্গে লিপ্ত হওয়ার যে পন্থা নিয়েছে তাতে ব্যবস্থার জনমুখী পরিবর্তন হবে, না ব্যবস্থা জনস্বাস্থ্য অভিযানকে গিয়ে খাবে তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

৪০৩.৪.৬.১৫ পত্র-পত্রিকা

স্বাস্থ্য আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বেশ কয়েকটা পত্র-পত্রিকা। MFC Bulletin, Issues in Medical Ethics, Radical Journal of Health, Doctors' Dialogue, ইত্যাদি প্রধানত তাত্ত্বিক আলোচনার মাধ্যমে। Drug, Disease, Doctor, BODHI, Rational Drug Bulletin মূলত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের যুক্তিসঙ্গত চিকিৎসার রীতি-নীতিতে অভ্যস্ত করানোর লক্ষ্যে প্রকাশিত। Health for the Millions, Health Action, অসুখ বিসুখ, সোসাল ফার্মাকোলজি বুলেটিন, স্বাস্থ্যের বৃত্তে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে প্রকাশিত।

৪০৩.৪.৬.১৫ গণসংগঠনের নেতৃত্বে স্বাস্থ্য আন্দোলন

এই ধারায় উল্লেখ করার মত ছত্তিশগড় মাইন্স শ্রমিক সংঘ ও ছত্তিশগড় মুক্তি মোর্চা পরিচালিত শহীদ হাসপাতাল আন্দোলন, ইন্দো-জাপান স্টীল ওয়ার্কার্স' ইউনিয়ন পরিচালিত বেলুড় শ্রমজীবী হাসপাতাল, কানোরিয়া জুট সংগ্রামী শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে গড়ে ওঠা শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের উদ্যোগে গঠিত শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ। ঘটনাচক্রে কর্মজীবনের বিভিন্ন পর্বে এই সব কটা

আন্দোলনেই যুক্ত থেকেছি আমি। কমরেড শংকর গুহ নিয়োগীর নেতৃত্বে ছত্তিশগড়ের শ্রমিক-স্বাস্থ্য আন্দোলন ১৯৭৭-এ দল্লী-রাজহরার ঠিকাদারী লোহাখনি-শ্রমিকদের ইউনিয়ন ছত্তিশগড় মাইন্স শ্রমিক সংঘকে নিয়োগী কেবল শ্রমিকের বেতন-বৃদ্ধি, বোনাস, চার্জশিটের জবাব লেখায় সীমিত রাখেন নি। শ্রমিক-জীবনের প্রত্যেকটা বিষয় স্থান পেয়েছিল ইউনিয়নের কর্মসূচীতে। ইউনিয়নের ১৭টা বিভাগের অন্যতম ছিল স্বাস্থ্য বিভাগ।

১৯৭৯-এ ইউনিয়ন উপাধ্যক্ষা কুসুম বাই স্থানীয় ভিলাই স্টীল প্ল্যান্ট হাসপাতালে ডাক্তার ও সেবিকাদের অবহেলায় প্রসবের সময়ে প্রাণ হারান। নেত্রীর মৃত্যুতে ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা নিজেদের প্রসূতি হাসপাতাল গড়ার শপথ নেন।

১৯৮০-র দশকের শুরুতে এক সফল শরাব-বন্দী আন্দোলন চালায় ইউনিয়ন। 'স্বাস্থ্য কে লিয়ে সংঘর্ষ করো' আন্দোলন আরম্ভ হয় ১৯৮১-র ১৫ই আগস্ট। ততদিনে ডা: বিনায়ক সেন ও ডা: আশীষ কুমার কুণ্ডু আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন। ডা: পবিত্র গুহ যোগ দেন মাস চারেক বাদে। আন্দোলনের প্রথম রূপ ছিল সাফাই আন্দোলন—শ্রমিকরা খনি-ম্যানেজমেন্টকে বাধ্য করে শ্রমিক বস্তি পরিষ্কার রাখার বন্দোবস্ত করতে।

১৯৮২-র ২৬শে জানুয়ারী শহীদ ডিস্পেন্সারীর কাজ আরম্ভ হয়। ১৯৮৩-৩রা জুন ১৯৭৭-এর শহীদদের স্মৃতিতে গড়ে তোলা হয় শহীদ হাসপাতাল। শহীদ হাসপাতাল 'মেহনতকশোঁ কে লিয়ে মেহনতকশোঁ কা আপনা কার্যক্রম' অর্থাৎ মেহনতী মানুষের জন্য মেহনতী মানুষের নিজস্ব কর্মসূচী।

শ্রমিকদের অর্থে ধীরে ধীরে গড়ে তোলা হয় এই প্রতিষ্ঠান। খনি শ্রমিকরা স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে এখানে কর্মরত। শ্রমজীবী পরিবারের ছেলে-মেয়েরা এই হাসপাতালের কর্মী। হাসপাতাল পরিচালনায় প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ছিল শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের। যুক্তিসঙ্গত ওষুধ ব্যবহার আন্দোলনের তাত্ত্বিক কথাগুলোর প্রথম বড় মাপের প্রয়োগ ঘটে এ হাসপাতালে—টনিক, কাশির সিরাপ, এনজাইম, ইত্যাদি অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর ওষুধের ব্যবহার নেই। অযৌক্তিক Fixed Dose Combination-এর ব্যবহার নেই। যেখানে ওষুধ ছাড়া কাজ চলে সেকানে ঘরোয়া ব্যবস্থাগুলোকে উৎসাহ দেওয়া হয়—কাশিতে গরম জলের ভাপ, ডায়রিয়ায় ঘরোয়া নুন-চিনির শরবৎ, জ্বর কমাতে জল দিয়ে মোছা...। শহীদ হাসপাতাল জনশিক্ষার একম াধ্যম রূপেও কাজ করে। যার উদ্দেশ্য—রোগের আর্থ-সামাজিক কারণ সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করা। রোগ-প্রতিরোধ রোগ-চিকিৎসার জ্ঞানে মানুষের ক্ষমতায়ন করা। দেওয়াল পত্রিকা 'স্বাস্থ্য সংগবারী, দ্বিমাসিক পুস্তিকা' লোক স্বাস্থ্য শিক্ষামালা' এবং মোহল্লা-গ্রামে প্রচার—স্লাইড শো, পোস্টার প্রদর্শনী, ম্যাজিক শো, ইত্যাদির মাধ্যমে স্বাস্থ্য-শিক্ষার কাজ চলত। জনসচেতনতা থেকে কিভাবে জন-আন্দোলন গড়ে ওঠে তার অভিনব নিদর্শন পাওয়া যায় এখানে—শুরু থেকে শহীদ হাসপাতালের প্রচারের বর্ষামুখ ছিল ডায়রিয়ার মৃত্যুর বিরুদ্ধে। এই প্রচারে জনসাধারণ ডায়রিয়া-প্রতিরোধে যথাযথ পানীয় জলের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হয়। ছত্তিশগড় মাইন্স শ্রমিক সংঘ ও ছত্তিশগড় মুক্তি মোর্চা এই সচেতন মানুষদের নিয়ে পানীয় জলের দাবীতে যে আন্দোলন গড়ে তোলে তার চাপে ১৯৮৯-এ স্থানীয় প্রশাসন ও ভিলাই স্টীল প্ল্যান্ট কর্তৃপক্ষ দাল্লী-রাজহরা ও তার আশেপাশের গ্রামগুলোতে ১৭৯টা নলকূপ বাসতে বাধ্য হয়। স্বাস্থ্যের সঙ্গে আর্থ-সামাজিক অবস্থার সম্পর্ক কত ঘনিষ্ঠ তা বোঝা যায় শহীদ হাসপাতালের আরেকটা অভিজ্ঞতা থেকে। শহীদ হাসপাতাল শুরুর ৬ বছর পর ১৯৮৯-এ দল্লী-রাজহরার সরকারী প্রাথমিক স্বাস্থকেন্দ্র শ্রমিক-বস্তিগুলোতে এক সমীক্ষা চালায়, তাতে দেখা যায় পোলিও-র সংখ্যা শূন্য। কারণ কেবল টীকাকরণ কর্মসূচী নয়। কারণ—ইউনিয়নের আন্দোলনের ফলে মজুরী বৃদিধ, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, বাসস্থানের উন্নয়ন, পানীয় জলের ব্যবস্থা, বয়স্ক-শিক্ষাকর্মসূচীর

পলে বাবা-মাদের সচেতনতা। শহীদ হাসপাতালের উপস্থিতির চাপে স্থানীয় ভিলাই স্টীল প্ল্যান্ট হাসপাতাল নিজের পরিষেবার উন্নয়ন ঘটাতে বাধ্য হয়, দল্লী-রাজহরায় একটা এবং ডোণ্ডী-লোহারা বিধানসভা ক্ষেত্রে সাতটা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খুলতে বাধ্য হয় সরকার।

৪০৩.৪.৬.১৫ সংঘর্ষ ও নির্মাণের রাজনীতি

শংকর গুহ নিয়োগী এক নতুন সমাজের স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছিলেন—

স্বপ্নের সমাজ যেখানে সবাই পানীয় জল পাবে, যেখানে সব খেতে সেচের ব্যবস্থা থাকবে, যেখানে সব কর্মক্ষম হাত কাজ পাবে, যেকানে কৃষক উৎপাদনের ন্যায্য দাম পাবে, যেকানে সব গ্রামে হাসপাতাল থাকবে, যেখানে সব শিশুর জন্য স্কুল হবে, যেখানে সবাই পাবে বাস্তু জমি আর ঘর, যেখানে দারিদ্র্য, শোষণ আর পুঁজিবাদ থাকবে না। সেই স্বপ্নের সমাজের ছোট্ট একটা টুকরো সাকার শহীদ হাসপাতালে। সমাজের শ্রেণী-বিভাজন অনুযায়ী যে ক্ষমতার সিঁড়ি দেখা যায় যে কোন চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে তা নেই এখানে। ডাক্তার থেকে সাফাই কর্মী সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেন নীতিগত ও প্রশাসনিক সব বিষয়ে। এর অনুপ্রেরণায় নতুন নতুন মানুষ নতুন সমাজের স্বপ্নের প্রতি আকৃষ্ট হন। বেলুড় শ্রমজীবী শহীদ হাসপাতালের অনুপ্রেরণায় ১৯৮৩-তে পথ চলা শুরু ইন্দো-জাপান স্টীল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ও পিপলস' এসোশিয়েশনের। খামারপাড়ার শ্রমিক-বস্তিতে প্রাথমিক স্কুলে চলে ক্লিনিক, স্বাস্থ্য সচেতনতা প্রয়াস, সার্জিকাল ক্যাম্প।

১৯৯৪-এর ১লা মার্চ বেলুড় মঠের কাছে জি. টি. রোডের ওপর শ্রমজীবী হাসপাতালের শুরু। নানা প্রতিকূলতা জয় করে বেড়ে উঠেছে এ হাসপাতাল। অত্যন্ত কম খরচে শল্য চিকিৎসার কেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

সম্প্রতি শ্রীরামপুরের কাছে বেলুমিল্কি গ্রামে শ্রমজীবী হাসপাতালের বিশাল ভবন তৈরী হয়েছে। কিন্তু প্রধান সমস্যা চিকিৎসকের। এছাড়া বেলুড় শ্রমজীবী হাসপাতালের একটা বড় দুর্বলতা যুক্তিসঙ্গত চিকিৎসার প্রতি যথাযথ দায়বদ্ধতার অভাব।

৪০৩.৪.৬.১৫ শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র

কানোরিয়া জুট সংগ্রামী শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে যাত্রা শুরু ১৯৯৫-এর ২০শে মার্চ। এলাকার কৃষিজীবী ও অসংগঠিত শ্রমজীবী মানুষের জন্য সংগঠিত শ্রমিকদের এ ছিল এক উপহার। চেঙ্গাইলের এক পরিত্যক্ত মুরগীর চালায় চলে প্রথম ৮ বছর। বিস্তীর্ণ এলাকার গরীব মানুষের আশা-ভরসার কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

২০০২-এর পরের আট বচরে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে তিনতলা ভবন। এখন ১৯ জন ডাক্তার, ১ জন ফিজিওথেরাপিস্ট, ১ জন অপ্টোমেট্রিস্ট, ১ জন সাইকোলজিস্ট, ১ জন স্পেশাল এডুকেটর, ২৭ জন অন্যান্য কর্মী। এক্স-রে, ইসিজি, প্যাথোলজি, আল্ট্রাসোনোগ্রাফি হয় বাজারের কম খরচে। আছে কম খরচে যুক্তিসঙ্গত ওষুধের দোকান।

সংগঠকরা এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে গড়ে তুলেছেন এক মডেল হিসেবে, যে মডেল প্রমাণ করে খুব কম খরচে আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া সম্ভবপর। যদি রোগীদের পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিহাস নেওয়া, সযত্ন শারীরিক পরীক্ষা করা হয়, পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার এবং ওষুধের যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার করা হয়।

৪০৩.৪.৬.১৫ শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ

শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা এ সংগঠন গড়ে তোলের ১৯৯৯-এ। মেহনতী মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষার আন্দোলনে যুক্ত ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সংগঠন হিসেবে এ পরিচিতি পেয়েছে। এরা ডা: নর্মান বেথুন, দ্বারকানাথ কোটনিস, বিজয় বসু, পূর্ণেন্দু ঘোষের পদাঙ্ক অনুসরণ করায় প্রয়াসী।

চিকিৎসাব্যবস্থার ব্যাপক ব্যবসায়ীকরণের স্রোতের বিরুদ্ধে এ সংগঠন প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, কম খরচে বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিপূর্ণ আধুনিক চিকিৎসা জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র, চেঙ্গাইল; বাউড়িয়া শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র; বাইনান শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র; মদন মুখার্জি স্মৃতি জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র, বেলিয়াতোড়, বাঁকুড়া এবং সুন্দরবন সীমান্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা, জেমসপুর, গোসাবায় চালানো ক্লিনিকগুলোতে এই প্রমাণ করার কাজ চলে। এ সংগঠন বিশ্বাস করে, যতই রোগ প্রতিরোধ কর্মসূচী, জনস্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মসূচী নেওয়া হোক না কেন, জনতার স্বাস্থ্যের অবস্থার সামান্যতম পরিবর্তনও হতে পারে না, যদি না স্বাস্থ্য কর্মসূচী খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, সংস্কৃতির আন্দোলনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত থাকে।

তাই এ সংগঠন শ্রমজীবী মানুষের ন্যায্য আন্দোলনগুলোর পাশে থাকার চেষ্টা করে—সিঙ্গুর জমিরক্ষার আন্দোলনে, নন্দীগ্রাম ভূমি, উচ্ছেদ প্রতিরোধে নন্দীগ্রাম গণহত্যাবিরোধী প্রচার মঞ্চ, নন্দীগ্রাম স্বাস্থ্য উদ্যোগ গড়ে তুলে লালগড় আন্দোলনে, পস্কো-বিরোধী আন্দোলন...জনসাধারণকে রোগের আর্থসামাজিক কারণ সম্পর্কে জানানো এবং চিকিৎসা বিষয়াকে ধোঁয়াশামুক্ত করে তাঁদের হাতে চিকিৎসার সহজ প্রযুক্তিগুলো তুলে দেওয়া এ সংগঠনের লক্ষ্য। নিজস্ব প্রকাশনা, অসুখ-বিসুখ পত্রিকা প্রকাশনায় অংশগ্রহণ, স্বাস্থ্যের বৃত্তে পত্রিকা প্রকাশনায় অংশগ্রহণ, গণ আন্দোলনের কর্মীদের স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে তৈরী করার কর্মসূচী চলে এই লক্ষ্যে।

এ সংগঠন বিশ্বাস করে, দেশী-বিদেশী, সরকারী-বেসরকারী ফান্ডিং এজেন্সির অনুদানের ওপর নির্ভরতা নয়, জনতার উদ্যোগে তাঁদের সামর্থ্যের ওপর দাঁড়িয়ে ওঠে স্বনির্ভর কর্মসূচীই আসলে জনমুখী হতে পারে। এ সংগঠন নিজের কর্মসূচীগুলোর রূপায়ণে চিকিৎসক ও অন্যান্য কর্মী এবং রোগীদের মধ্যে এমন সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায়, যেমনটা হবে শোষণহীন নতুন সমাজে।

৪০৩.৪.৬.১৫ অন্যান্য জনস্বাস্থ্য উদ্যোগ

সরবেড়িয়ার সুন্দরবন শ্রমজীবী হাসপাতাল, কামারহাটির জনসেবা ক্লিনিক, পুরুলিয়ার বান্দোয়ানে ভালোপাহাড় স্বাস্থ্য কেন্দ্র, বাঁকুড়ার ছাতনা ব্লকে আমাদের হাসপাতাল, পশ্চিম মেদিনীপুরের কুসুমাশুলি গ্রামে প্রেমসেবা হাসপাতাল আরও কিছু জনমুখী স্বাস্থ্য কর্মসূচী, কোনটার ওপর বেলুড় শ্রমজীবীর প্রভাব, কোনটার ওপর শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগের।

কিন্তু হাজার জনস্বাস্থ্য কর্মসূচী দেশের সমস্ত নাগরিকের স্বাস্থ্যরক্ষা করতে পারে না। দায়িত্ব নিতে হবে রাষ্ট্রকে। যেমন নিয়েছিল/নিয়েছে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো। এখনও যেমন নিচ্ছে ব্রিটেন, কানাডর মত দেশ। স্বাস্থ্যের অধিকারের লড়াইকে এগিয়ে নিতে জনমুখী স্বাস্থ্য কর্মসূচীগুলোর পারস্পরিক আদান-প্রদান চাই। এক

আন্দোলন থেকে অন্য আন্দোলনের শিক্ষা নেওয়া চাই। স্বাস্থ্য আন্দোলনকে বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলনের অঙ্গ করে তোলা চাই।

চিকিৎসা ব্যবস্থার সামাজিকীকরণ চাই, যেমন বলেছিলেন ডা: নর্মান বেথুন—

1. দেশের ডাক ও তার, সৈন্য ও নৌবাহিনীর, বিচার ও শিক্ষা বিভাগের মতো জনস্বাস্থ্যরক্ষার দায়িত্বও সরকারের।
2. সরকারকেই এর জন্য সমস্ত ব্যয় বহন করতে হবে।
3. সকলের জন্য সমাজ চিকিৎসার সুযোগ করে দিতে হবে। কে কত রোজগার করে তা না দেখে প্রত্যেকের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনমতো চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। দান ও দাক্ষিণ্যের পাট তুলে দিয়ে ন্যায়-বিচারকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। দয়া-দাক্ষিণ্য দাতাকে ছোট করে আর গ্রহীতার চরিত্রকে করে কলঙ্কিত।
4. স্বাস্থ্যরক্ষার কাজে যারা নিযুক্ত তাদের জন্য সরকারী তহবিল থেকে বেতন ও পেনশন দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।
5. স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়ে একটা স্বায়ত্বশাসিত গণতান্ত্রিক চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।

স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও চিকিৎসাব্যবস্থার সামাজিকীকরণের জন্য সংগ্রাম ছাড়া পথ নেই।

বিগত দুদশকে শহর পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যের চেহারাটা পাল্টে গিয়েছে। মধ্যবিত্ত জনসমাজ এখন আর সরকারি হাসপাতালে যান না। গড়ে উঠেছে ছোট বড় নার্সিং হোম বা প্রাসাদোপম হেলথ হাব, এমনকী সরকারি হাসপাতালে শুরু হয়ে গিয়েছে পিপিপি মডেল অর্থাৎ পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ। স্বাস্থ্যবিমাকেন্দ্রিক বড়লোকি চিকিৎসা এ রাজ্যে কেন, সারা দেশ জুড়েই শুরু হয়েছে। তার পাশাপাশি সরকারি হাসপাতালেও বেসরকারিকরণের নানা উদ্যোগ হাজির। একই হাসপাতালে বিকেলবেলা দেখালে ফি দিতে হয়, হাসপাতালের মধ্যেই এক্স-রে করালে বেশি টাকা দিতে হয়। এই সব প্রক্রিয়া আমলের আগেই হয়তো শুরু হয়েছে। আসলে ব্যাপারটা কোনও রাজনৈতিক আমলের নয়। গোটা দেশ জুড়ে এই প্রবণতাটা বাড়ছে, যার মূল কথা, স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য মূল্য দিতে হবে বা টাকা গুনতে হবে। স্বাস্থ্য আন্দোলন কিন্তু ঠিক এর উল্টো কথাটাই বলে; স্বাস্থ্য মানুষের অধিকার। শুধু প্রাসাদোপম হাসপাতাল তৈরি বা চিকিৎসকদের হয়রানি করা অথবা প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম না থাকার মতো বিষয়ের বাইরে আরও বড় করে বিষয়টা ভাবা দরকার। সেই ভাবনার ইতিহাসটা জানা দরকার। আর সেই জন্যই দরকার আমাদের স্বাস্থ্য আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান, যে আন্দোলন শিখিয়েছে স্বাস্থ্য পরিষেবা কোনও ভিক্ষা নয়, বরং মানুষের অধিকার।

পর্যায়-৬

একক-১৬

বিন্যাসক্রম

৪০৩.৪.৬.১৬ উদ্দেশ্য

৪০৩.১.২ 1

৪০৩.১.৩ ১

৪০৩.৪.৬.১৬ ভারতে স্বাস্থ্য বীমা

ভারতে স্বাস্থ্য বীমা একটি ফেডারেল ধারণা, যা মূলত ১৯৩৮ সালের বীমা আইন এবং ১৯৯৯ সালের IRDAI ACT দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ভারতে স্বাস্থ্য বীমার বিবর্তন প্রকাশ করে যে এটি এখনও অনেক উন্নয়নশীল দেশ থেকে পিছিয়ে রয়েছে। উন্নত চিকিৎসা সুবিধার বর্ধিত প্রাপ্যতা, চিকিৎসা ব্যয়ের সাথে ক্রমবর্ধমান আয় এবং ক্রমবর্ধমান স্বাস্থ্য সচেতনতা ভারতীয় স্বাস্থ্য বীমা খাতের উন্নতিতে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রেখেছে। অগণিত স্বাস্থ্য বীমা পরিকল্পনা ধীরে ধীরে আবির্ভূত হয়েছে।

৪০৩.৪.৬.১৬ ভারতে স্বাস্থ্য বীমা সূত্রপাত

স্বাধীনতা-উত্তর যুগে ভারতে স্বাস্থ্য বীমার প্রাথমিক প্রবর্তন হয়েছিল। ১৯৪৮ সাল থেকে ধীরে ধীরে বেশ কিছু সরকারি কর্মসূচি চালু করা হয়। এর মধ্যে এমপ্লয়ার স্টেট ইন্স্যুরেন্স স্কিম (Employer State Insurance Scheme) চালু করা ছিল। এটি ভারতীয় স্বাস্থ্য বীমার ইতিহাসে প্রাথমিক মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত।

বিশেষ করে সংগঠিত সেক্টরে নীল-কলার কর্মীদের জন্য সুরক্ষিত সুরক্ষা হিসাবে ESIS (Empolyees' State Insurance Corporation) চালু করা হয়েছিল। এটি অসুস্থতাজনিত রোজগার ক্ষতি এবং অন্যান্য চিকিৎসা জরুরী অবস্থার ক্ষতিপূরণের জন্য নগদ সুবিধা সহ IPD এবং OPD খরচের জন্য কভারেজের অনুমতি দেয়।এই পুরানো স্কিমটি এখনও বিদ্যমান এবং নিয়োগকর্তা এবং কর্মচারী উভয়ের দ্বারা পারস্পরিক অর্থায়ন করা হয়।

৪০৩.৪.৬.১৬ ভারতে স্বাস্থ্য বীমার উল্লেখযোগ্য মাইলফলক

১৯৫৪ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্পটি চালু হয়। এটি ব্যাপক স্বাস্থ্যসেবা পরিষেবা প্রদানের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল। এটি বিশেষভাবে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী এবং তাদের পরিবারের জন্য

পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য প্রকল্পটি এখনও চলমান আছে এবং বিশেষত কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের সাথে তাদের পরিবারগুলিকে সুরক্ষা প্রদান করে। কর্মচারী এবং সরকার পারস্পরিকভাবে এই প্রকল্পটি চালানোর জন্য তাদের বেতন গ্রেড অনুযায়ী অবদান রাখে।

১৯৮৬ সালে, GIC বা General Insurance Corporation of India স্বাস্থ্য বীমার সমস্ত প্রাসঙ্গিক শর্তাবলী বিধিবদ্ধ করে এবং দেশের প্রাথমিক মেডিক্লেম নীতি চালু করে। এই স্কিমটি PED, মাতৃত্ব এবং প্রসবের খরচ, HIV/AIDS ইত্যাদি বাদ দিয়ে হাসপাতালে ভর্তি কভারেজ প্রদান করে। ক্ষতিপূরণ নীতির উপর নির্ভর করে, সমস্ত প্রাসঙ্গিক খরচ তৃতীয় পক্ষের (বিমা কতৃপক্ষ) প্রশাসক নীতির মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিশোধ করা হয়।

১৯৯১ সালে অর্থনৈতিক নীতির সংশোধনের পর, সরকার উদারীকরণ পদ্ধতি চালু করে, যা স্বাস্থ্য বীমা ক্ষেত্রের বেসরকারীকরণের অনুমতি দেয়। ভারতীয় সংসদ IRDA বিল পাশ করেছে। ভারতীয় স্বাস্থ্য বীমা খাতের ইতিহাসে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। বিভিন্ন বেসরকারি বিমা সংস্থাও এই ব্যবস্থায় যুক্ত হয়।

১৯৯০ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে, দরিদ্র রোগীদের বিবেচনা করে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব এবং জনস্বাস্থ্য খাতে ব্যয় করার প্রবণতা ছিল। ২০০০ এবং ২০০৫ এর মধ্যে যুগে, এই সেক্টরটি প্রাথমিকভাবে নিয়ন্ত্রক কৌশল এবং প্রক্রিয়াগুলিতে পর্যালোচনা করার জন্য সচেষ্ট হয়েছে। এই পর্যালোচনাটি স্টেকহোল্ডারদের গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে এই সেক্টরের সার্বিক উন্নয়নের জন্য নোড এজেন্সি, কমিউনিটি হেলথ ইন্স্যুরেন্স এবং এনজিওদের জড়িত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে। ২০০০ এর দশকের শেষের দিকে, অনেক মানুষ বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হয়ে ওঠে এবং তুলনামূলকভাবে উচ্চ আয়ের মানুষদের স্বাস্থ্য বীমা কেনার সম্ভাবনা বেশি হয়ে ওঠে। COVID-১৯ মহামারীর প্রাদুর্ভাবের পর থেকে, প্রতিটি স্বাস্থ্য বীমা সংস্থার, বিশেষ করে ভারতের প্রবীণ নাগরিকদের জন্য স্বাস্থ্য বীমা, মানসিক স্বাস্থ্য কভারেজ অন্তর্ভুক্ত করা বাধ্যতামূলক হয়ে উঠেছে। চিকিৎসা ক্ষেত্রের ক্রমবর্ধমান ব্যয় ও সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার ধীর গতির উন্নতি স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে। মুলত ব্যাবসায়িক সংস্থা হওয়ার ফলে সেখানের ব্যয়বহুল অথচ উন্নত চিকিৎসার জন্য বিমার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। যার ফলে প্রাইভেট কোম্পানিগুলো উৎকর্ষ সাধন করেছে। যদিও পাশাপাশি সরকারি হস্তক্ষেপ বর্তমানে বৃদ্ধি পেয়েছে, কেন্দ্র তথা রাজ্য সরকার গুলি সাধারন মানুষের জন্য স্বাস্থ্য বিমা চালু করেছে, উদাহরণ স্বরূপ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প বা ভারত সরকারের আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প গুলির নাম করা যায়।

৪০৩.৪.৬.১৬ উপসংহার

ভারতীয় স্বাস্থ্য বীমা খাত অনেক দূর এগিয়েছে কিন্তু জনসংখ্যা এবং স্বাস্থ্য বীমা-উপভোক্তা ব্যক্তিদের মধ্যে বিদ্যমান ব্যবধান পূরণ করতে আরও দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে। এখনও অনেক দামি চিকিৎসা বিমার আওতাভুক্ত নয়, অনেক মূল্যবান ইঞ্জেকশন বিমার অন্তর্ভুক্ত নয়, কারণ তার জন্য হসপিটালে ভর্তি হতে হয়ে না। কিন্তু সাধারন মানুষের পক্ষে সেই চিকিৎসা করা সম্ভব নয়। যেমন প্রদাহমূলক বাতের Biologics,

অণুচক্রিকা বৃদ্ধি করার Romi ইত্যাদি। বিমা সংস্থা গুলির ব্যাবসায়িক স্বার্থের পাশাপাশি সেবামূলক মানসিকতা এই অবস্থার উন্নতি করতে পারে।

৪০৩.১.১৩ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১) Discuss briefly about Peoples' Health Movement in India.

২) What is the history of Health Insurance in India?